কাকাবাবু সমগ্র

সবুজ দ্বীপের রাজা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গলিইবুক.কম
2021

সূচিপত্র

১. জাহাজে যেতে চাও, না এরোপ্লেনে..2
২. পাছে ঠিক সময় ঘুম না ভাঙে..10
৩. প্লেনটা ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল 20
৪. কাছেই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল 33
৫. তীরের কাছে সমুদ্রের জল 43
৬. রঙ্গতে পৌঁছনো গেল..57
৭. পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছতে-পৌঁছতে..63
৮. সন্তু জলে লাফিয়ে পড়ার পর 70
৯. দাশগুপ্তর মনটা ভাল নেই..98
১০. গুণদা তালুকদার 107

১. জাহাজে যেতে চাও, না এরোপ্লেনে

জাহাজে যেতে চাও, না এরোপ্লেনে?

কাকাবাবুর কথা শুনেই সন্তুর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। খুব বেশি আনন্দ হলে বুকের মধ্যে এ-রকম টিপটপ করে। ঠিক ভয়ের মতন। মনে হয়, হবে তো? শেষ পর্যন্ত হবে তো?

সবেমাত্র পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ক্লাস নাইন থেকে সন্তু এবার টেনে উঠবে। শেষ পরীক্ষার দিনই কাকাবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, সন্তু, এখন তো তোমার ছুটি থাকবে, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে এক জায়গায়?

সন্তু তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি। কাকাবাবুর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া মানেই, তো দারুণ ব্যাপার। নতুন কোনও অ্যাডভেঞ্চার হবে নিশ্চয়ই। অন্যরা বেড়াতে গিয়ে শুধু সুন্দর-সুন্দর জিনিস দেখে। আর কাকাবাবু যান বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে।

সন্তু সঙ্গে গেলে কাকাবাবুরও অনেক সুবিধে হয়। কাকাবাবুর বয়েস তিপন্ন চুয়ান্নর মতো, যদিও দেখলে একটুও বুড়ো মনে হয় না। গায়ে বেশ জোর আছে, মুখে প্রকাণ্ড গোঁপ, কিন্তু কাকাবাবুর একটা পা চিরকালের মতন নষ্ট হয়ে গেছে। দিল্লিতে পুরাতত্ত্ব বিভাগে তিনি খুব বড় চাকরি করতেন। একবার আফগানিস্তানে পাহাড়ি রাস্তায় তাঁর জিপ গাড়িটা উল্টে খাদে পড়ে যায়। সেবার মরতে-মরতেও বেঁচে উঠলেন, তবে একটা পা আর কিছুতেই ঠিক হল না। ডান পায়ের পাতার হাড়গুলো ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে পারেন।

সেই দুর্ঘটনার পর চাকরি ছেড়ে দিলেন কাকাবাবু, কিন্তু বাড়িতে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না একদম। আবিষ্কারের নেশা ওঁর এখনও রয়ে গেছে। ওঁর ঘরে কত যে পুরনো বই, তার ঠিক নেই। সেইসব বই পড়ে, যে-সব রহস্যের আজও সমাধান হয়নি, তিনি

সেগুলোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে চান। কিন্তু এবারে কোথায় যাওয়া হবে, কিসের সন্ধানে, তা এখনও সন্তু জানে না। কাকাবাবুর এই এক দোষ, আগের থেকে কিছুই বলেন না। বড্ড গম্ভীর লোক।

কাকাবাবু যখন জিজ্ঞেস করলেন জাহাজে না এরোপ্লেনে যাওয়া হবে, তখন সন্তু দারুণ একটা চিন্তার মধ্যে পড়ল। সে কোনওদিন জাহাজেও চাপেনি, প্লেনেও চাপেনি। কোনটা বেশি ভাল? কিছুতেই ঠিক করতে পারে না।

জাহাজে কিংবা প্লেনে যেতে হবে যখন, তখন নিশ্চয়ই খুব দূরের কোনও দেশে যাওয়া হচ্ছে এবার। আফ্রিকা? দক্ষিণ আমেরিকা? আনন্দে সন্তুর একেবারে নাচতে ইচ্ছে করল। তার ইস্কুলের বন্ধুদের মধ্যে কেউ এত দূর বিদেশে যায়নি।

কাকাবাবু, আমরা কোথায় যাব?

সেটা তো গেলেই দেখতে পাবে!

সন্তু জানত, কাকাবাবু এই উত্তরই দেবেন। তবু জিজ্ঞেস না-করে থাকতে পারছিল না। এবার সে বলল, আমরা তাহলে প্লেনেই যাব।

কাকাবাবু বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে।

সন্তুর জাহাজে চড়ারও খুব ইচ্ছে ছিল। তবু প্লেনের কথাই বলল। প্লেনে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। ফেরার সময় জাহাজে ফিরলেই হবে।

এর পর দুদিন কাকাবাবু আর কিছু বললেন না। তাঁকে খুব ব্যস্ত মনে হল। সকালবেলা বেরিয়ে যান, ফেরেন অনেক রাত্রে। সন্তু বুঝতে পারল, কাকাবাবু সব ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা সেরে ফেলছেন। গভর্নমেন্টের লোকেরা কাকাবাবুকে খুব খাতির করেন।

এর মধ্যে একদিন রাস্তায় রিনির সঙ্গে সন্তুর দেখা হল। রিনি সিদ্ধার্থদা, আর স্নিগ্ধাদির সঙ্গে শিগগিরই গোয়া বেড়াতে যাচ্ছে। ওরা বোম্বে পর্যন্ত ট্রেনে যাবে, তারপর সেখান থেকে জাহাজে। কথাটা শুনে সন্তুর একটু খটকা লাগল। গোয়াতেও জাহাজে যাওয়া যায়? তাহলে কাকাবাবুও কি গোয়াতেই যেতে চাইছেন? গোয়াতে গেলে রিনিদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সেবার যেমন কাশ্মীরে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল।

রিনি সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, তোরা এবার কোথাও যাচ্ছিস না?

সন্তু তো এখনও জায়গাটার নাম ঠিক মতন বলতে পারছে না, তাই বলল, কি জানি, দেখি, ঠিক নেই এখনও!

সেদিন রাত্তির বেলা বাড়ি ফিরে কাকাবাবু আবার সন্তুকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, সন্তু, তোমার কাছে তোমার নিজের ফটো আছে?

মাসখানেক আগেই সিদ্ধার্থদা তাঁর নতুন ক্যামেরায় সন্তুর অনেকগুলো ছবি তুলে দিয়েছেন। সন্তু দৌড়ে গিয়ে সেই খামটা নিয়ে এল। কাকাবাবু সবকটা ছবি নেড়েচেড়ে দেখলেন। তারপর সেগুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন, নাঃ, এগুলোতে চলবে না।

সন্তু অবাক হয়ে গেল। ছবিগুলো খুবই সুন্দর, সবাই প্রশংসা করেছেন।

বাবা-মারও খুব ভাল লেগেছে। কাকাবাবুর পছন্দ হল না?

কাকাবাবু বললেন, দুটো কান দেখা যায়, এমন ছবি চাই। সন্তু আরও অবাক। কান? লোকে মুখের ছবিই তো দেখে, কান দুটো আলাদা করে দেখে নাকি? অজান্তেই সন্তু নিজের কানে হাত দিল।

কাকাবাবু বললেন, আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, কাল সকালেই রাসবিহারী এভিনিউতে যে জুবিলি ফটোগ্রাফার্স আছে, সেখানে গিয়ে ছবি তুলিয়ে আসবে। আর বিকেলেই সেখান থেকে তোমার ছখানা ছবি নিয়ে আসবে। খুব জরুরি!

কাকাবাবু তার ছখানা ছবি নিয়ে কী করবে, সেকথা সন্তু আকাশ পাতাল চিন্তা করেও বুঝতে পারল না। যাই হোক, পরদিন সকালেই সে জুবিলি ফটোগ্রাফার্সে ছবি তুলিয়ে এল। বিকেলেই নিয়ে এল ছখানা ছবি। সবকটা ছবি একই রকম। শুধু মুখের ছবি, দুটো কানই ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে বটে!

সন্তু আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছে না। রাত্তিরবেলা মাকে সে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, মা, এবার কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে?

মা বললেন, এবার তো দার্জিলিং যাওয়া হচ্ছে!

দার্জিলিং? দার্জিলিং তো পাহাড়ের ওপরে, সেখানে আবার জাহাজে করে যাওয়া যায় নাকি? প্লেনে করে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু কাকাবাবু তো জাহাজের কথাও জিজ্ঞেস করেছিলেন? সন্তু একটু হতাশ হয়ে গেল।

মা আবার বললেন, দার্জিলিংয়ে তোর ছোট মামা থাকেন, ছোট মামাকে মনে আছে তো? সেই যে একবার তোকে একটা বাঁশি কিনে দিয়েছিলেন? সে আজ দার্জিলিংয়ে মস্ত বড় বাড়ি পেয়েছে অফিস থেকে, সেই বাড়িতে আমরা সবাই উঠব।

সন্তু বলল, তোমরাও যাচ্ছ নাকি?

মা বললেন, তার মানে? আমরা যাব না তো কে যাবে?

কাকাবাবুও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন?

ও সেই কথা বল। ঠাকুরপো আমাদের সঙ্গে যাবেন কেন? উনি তো প্লেনে করে কোথায় যেন যাবেন বলছিলেন। সিঙ্গাপুর না। অসম, কী যেন জায়গা! তোর বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে।

সন্তু হাসল। মা একদম ভূগোল ভুলে গেছেন। সিঙ্গাপুর আর অসম কি কাছাকাছি জায়গা হল নাকি?

আমিও তো কাকাবাবুর সঙ্গে যাচ্ছি।

মা একটু রাগের সঙ্গে বললেন, সে জানি! তুই তো আর আমাদের সঙ্গে যেতে চাস না!

সে-কথা সত্যি। সন্তু খুব ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেত, তখন খুব ভাল লাগত। এখন আর ভাল লাগে না। এখন কাকাবাবুর সঙ্গে যাবার জন্যই তার বেশি উৎসাহ।

সোমবার দিন সকালবেলা কাকাবাবু বললেন, সন্তু, খাওয়া হয়ে গেলে তুমি জামা প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নেবে। তুমি আজ আমার সঙ্গে বেরুবে।

সন্তু ভাবল, সেইদিনই বুঝি বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে বলল, বাক্স-টাক্সি গুছিয়ে নেব?

কাকাবাবু বললেন, না, না, তার দরকার নেই। এমনি তুমি আমার সঙ্গে এক জায়গায় কাজে যাবে।

দুপুরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে কাকাবাবু সন্তুকে নিয়ে এলেন ডালহৌসিতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন একটা অফিস-বাড়ির দোতলায়। ক্রাচ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে খুব অসুবিধে হয় না। কাকাবাবুর। বেশ সাধারণ লোকের মতোই টক্‌টক করে উঠে যান। কিন্তু পাহাড়ে উঠতে খুব কষ্ট হয়। কাশ্মীরে যেবার কণিষ্কের মুণ্ডুর সন্ধানে যাওয়া হয়েছিল, সেবারে তো কাকাবাবু একবার পাহাড় দিয়ে গড়িয়েই পড়ে গিয়েছিলেন। তবে, কখনও কোনও উঁচু পাঁচিল টপকাতে গেলে কাকাবাবু দুহাতের ওপর ভর দিয়ে অনায়াসেই লাফিয়ে পার হয়ে যেতে পারেন। একটা পা নেই বলেই কাকাবাবুর হাত দুটোতে জোর সাঙ্ঘাতিক।

কাকাবাবু একজন অফিসারের ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে খুব খাতির করে বললেন, আসুন, আসুন, মিঃ রায়চৌধুরী। এইটি কি আপনার ভাইপো নাকি?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ। এর নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী। এ আমার সঙ্গে যাবে।

সন্তু কাকাবাবুর পাশের চেয়ারে বসল। তারপর অফিসারটি তাকে কিছু কাগজপত্র সই করতে দিলেন। খানিকটা বাদে তিনি সুন্দর করে বাঁধানো দুটি নীল রঙের ছোট্ট, শক্ত বই কাকাবাবুকে দিয়ে বললেন, এই নিন, মিঃ রায়চৌধুরী! আচ্ছা, আমার শুভেচ্ছা রইল।

অফিসারটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাকাবাবু সন্তুকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। সন্তু এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, এটা পাসপোর্ট অফিস। পাসপোর্ট কথাটা আগে শুনেছে সন্তু, কিন্তু জিনিসটা কখনও চোখে দেখেনি।

কাকাবাবু সেই ছোট নীল বইয়ের একটা সন্তুকে দিয়ে বললেন, এই নাও, এটা তোমার পাসপোর্ট, খুব সাবধানে রাখবে নিজের কাছে।

সন্তু বইটা খুলে দেখল। প্রত্যেক পাতায় বেশ বড় অশোকচক্রের ছাপ মারা। প্রথম দিকেই বাঁ দিকের পাতায় সন্তুর ছবি আটকানো। সেই দুকান সমেত মুখের ছবি।

বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। এই সময় খালি ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত। কোনও ট্যাক্সিই থামছে না। ক্রাচ নিয়ে কাকাবাবু বাসেও উঠতে পুরুবেন না। মহা মুশকিল। অনেকক্ষণ বাদে একটা ট্যাক্সি পাসপোর্ট অফিসের সামনেই থামল, তা থেকে কয়েকজন লোক নামছে। সন্তু সেই ট্যাক্সিটা ধরবার জন্য যেই দৌড়ে গেল, অমনি একজন লোকের সঙ্গে তার খুব জোরে ধাক্কা লাগল। সন্তু ঘুরে পড়েই যাচ্ছিল, সামনে নিল কোনওক্রমে, কিন্তু পাসপোর্ট বইখানা ছিটকে গেল তার হাত থেকে।

সন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখল। লোকটা বিদেশি। সন্তু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে, লোকটা তাকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছে। সাহেবরা তো সাধারণত এরকম অভদ্র হয়

না। সন্তু লোকটিকে কিছু বলার সুযোগ পেল না, তার আগেই সে খালি ট্যাক্সিটাতে উঠে বসল। লোকটা তাহলে ট্যাক্সিটা নেবার জন্যই এরকম ধাক্কা মেরে দৌড়ে গেল!

পাসপোর্ট বইখানা ছিটকে গিয়ে পড়েছে ফুটপাতের ধারে। আর একটু হলেই পাশের জলকাদার মধ্যে পড়ত। সন্তু দৌড়ে গিয়ে সেটা নেবার আগেই আর-একটা ময়লা-পোশাক-পরা ভিখিরির মতন ছেলে ছোঁ। মেরে তুলে নিল সেটা। তারপর পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। এর মধ্যেই কাকাবাবু এগিয়ে এসে একটা ক্রাচ তুলে খুব জোরে মারলেন ছেলেটার হাতে। ছেলেটা উঃ করে চেঁচিয়ে উঠে পাসপোর্টটা ফেলে দিল। কিন্তু আর দাঁড়াল না, দৌড়ে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। এদিকে সেই বিদেশি সাহেবটিকে নিয়ে ট্যাক্সিটাও ছেড়ে গেছে।

ব্যাপারটা এমনই হঠাৎ হল যে, সবটা বুঝতেই খানিকটা সময় লাগল সন্তুর। সাহেবটা তাকে ধাক্কা মারল আর ঠিক সেই সময়েই ভিখিরি ছেলেটা তার পাসপোর্টটা চুরি করবার চেষ্টা করল—এর মধ্যে কি কোনও যোগ আছে? না দুটো আলাদা-আলাদা ব্যাপার? ভিখিরি ছেলেটার পাসপোর্ট চুরি করে কী লাভ?

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, তোমাকে বললাম না, পাসপোর্টটা খুব সাবধানে রাখতে?

মা যেমন ভাবে ছেলেকে আদর করে, কিংবা ফোঁড়া হলে আমরা যে-রকম ভাবে তার ওপর হাত বুলোই, সন্তু ঠিক সেইরকমভাবে পাসপোর্টটা তুলে নিয়ে সেটার ওপর হাত বুলোতে লাগল। ভাগ্যিস জলকাদায় পড়েনি, এমন সুন্দর জিনিসটা তা হলে নষ্ট হয়ে যেত।

আর একটা ট্যাক্সি পেতে বেশি দেরি হল না। তাতে উঠে বসে সন্তু একটু আগের ঘটনাটা ভাবতে লাগিল। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত মনে হল এমনিই একটা হঠাৎ-ঘটে-যাওয়া ঘটনা। যদিও এর আসল মানে সন্তু বুঝতে পেরেছিল বেশ কয়েকদিন পরে।

যাই হোক, পাসপোর্টটা পাবার পর সন্তুর আর সন্দেহ রইল না যে, সে এবার বিদেশেই যাচ্ছে। গোয়া কিংবা দার্জিলিং যেতে তো পাসপোর্ট লাগে না! কবে যাওয়া হবে তার ঠিক হয়নি এখনও, কিন্তু সন্তু এর মধ্যেই বাক্স-টাক্সি গুছিয়ে একেবারে তৈরি। কিন্তু সব গুছোনো ওলোট-প্যালেট করতে হল। আবার। শুক্রবার দিন রাত্তিরে, কাকাবাবু বললেন, সন্তু, কাল ভোরে আমরা যাচ্ছি! ছাঁটার সময় প্লেন। সাড়ে চারটের সময়ই ঘুম থেকে উঠে পড়তে হবে। জিনিসপত্র এখনই গুছিয়ে রাখো।

সন্তু আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠল। বলল, আমার সব গুছোনো ঠিকঠাক করাই আছে।

কাকাবাবু বললেন, দেখি, বাক্স নিয়ে এসো?

বাক্স খুলে দেখে কাকাবাবু বললেন, একী, এত কোট-সোয়েটার নিয়েছ। কেন? গরম জামা-টামা লাগবে না! বেশি করে গেঞ্জি নাও!

বিদেশে যাবে, অথচ গরম জামা লাগবে না, এ আবার কী? তাহলে কি আরব-পারস্যের মতন কোনও মরুভূমির দেশে যাওয়া হচ্ছে? সেগুলোও বিদেশ অবশ্য!

২. পাছে ঠিক সময় ঘুম না ভাঙে

পাছে ঠিক সময় ঘুম না ভাঙে, তাই সন্তু সারারাত ঘুমোলই না প্রায়। জেগে। জেগে সে ঘড়ির আওয়াজ শুনল, একটা-দুটো-তিনটে। কিন্তু শেষ সময়েই সে ঘুমিয়ে পড়ল ঠিক। মা যখন তাকে ডেকে তুললেন, তখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে। ঘড়ি দেখেই তার ভয় হল। কাকাবাবু রাগ করে একাই চলে যাননি তো?

না, কাকাবাবু যাননি। মা কাকাবাবুকেও একটু আগে ডেকে দিয়েছেন। কোথাও বাইরে যাবার সময় মা-ই সবাইকে ঠিক সময় তুলে দেন। মার কোনওদিন ভুল হয় না।

খুব তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নিল সন্তু। কাকাবাবুর অনেক আগে। মা কত কী খাবার তৈরি করেছেন। এরই মধ্যে, কিন্তু উত্তেজনার চোটে সন্তুর খেতে ইচ্ছেই করছে না।

মাকে জিজ্ঞেস করল, এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি, তুমি এখনও জানো না, মা?

মা বললেন, ঐ তো শুনলাম, সিঙ্গাপুর না কোথায় যেন যাওয়া হচ্ছে। দেখিস বাপু, খুব সাবধানে থাকিস। তোর কাকাটি যা গোঁয়ার

কাকাবাবু খাবার ঘরে এসে বললেন, সন্তু, রেডি? বাঃ! পাঁচটা বাজল, আর দেরি করা যায় না। যাও, একটা ট্যাক্সি ডাকো এবার

সন্তু রাস্তায় বেরিয়ে এল। ভোরবেলা ট্যাক্সি পাওয়ার কোনও অসুবিধে নেই। ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে সন্তু আবার তরতর করে উঠে এল ওপরে। কাকাবাবু এর মধ্যে খাবার ঘর ছেড়ে চলে গেছেন নিজের ঘরে। দরজাটা ভেজানো। দরজাটা ফাঁক করে কাকাবাবুকে ডাকতে গিয়ে সন্তু থমকে গেল।

বড় লোহার আলমারিটা খোলা। সেটার সামনে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু একটা □ীভালভারে গুলি ভরছেন একটা-একটা করে।

সন্তু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এর আগে সে কাকাবাবুর সঙ্গে অনেক বার বাইরে গেছে, কোনওবার তো কাকাবাবুকে রিভলভার সঙ্গে নিয়ে যেতে দেখেনি। এবার কি আরও বিপজ্জনক কোনও জায়গায় যাওয়া হচ্ছে!

গুলি ভরা হয়ে গেলে কাকাবাবু রিভলভারটা সুটকেসের মধ্যে জামা-কাপড়ের নীচে সাবধানে রেখে দিলেন।

প্লেনে চাপাবার কথা ভেবেই সন্তুর এত আনন্দ হচ্ছে যে, তার মুখ দিয়ে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে। জীবনে প্রথম সে প্লেনে চাপবে। প্লেনটা যখন ব্যাঁকা হয়ে মাটি থেকে আকাশে ওড়ে, তখন ভেতরের মানুষগুলো গড়িয়ে পড়ে যায় না?

দমদমে প্লেনে ওঠার আগে সবাইকে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হল। সেই ঘরের দরজায় লেখা আছে সিকিউরিটি চেকিং। একজন একজন করে সেই ঘরে ঢুকছে। কাকাবাবুর আগে সন্তুই ঢুকল। একজন পুলিশের পোশাক পরা লোক সন্তুর কাঁধের ঝোলানো ব্যাগটার দিকে আঙুল উচিয়ে বলল, দেখি, ওর মধ্যে কী আছে?

ব্যাগটার মধ্যে রয়েছে কয়েকটা গল্পের বই, তোয়ালে আর মায়ের দেওয়া খাবারের কৌটো। লোকটা সেগুলো এক নজর শুধু দেখল। তারপর সন্তুর গায়ে দু হাত দিয়ে চাপড়াতে লাগল। প্রথমে সন্তু এর মানে বুঝতে পারেনি। তার পরেই মনে পড়ল। লোকটি দেখছে, সন্তু জামা প্যান্টের মধ্যে কোনও রিভলভার কিংবা বোমা লুকিয়ে রেখেছে। কিনা। খবরের কাগজে সে পড়েছে, আজকাল প্রায়ই প্লেন-ডাকাতি হয়। চলন্ত প্লেনে ডাকাতরা পাইলটের সামনে রিভলভার কিংবা বোমা দেখিয়ে প্লেনটা অন্য জায়গায় নিয়ে যায়।

কাকাবাবুর কাছে তো রিভলভার আছে, ওরা সেটা কেড়ে নেবে? ও, সেইজন্যই কাকাবাবু রিভলভার পকেটে না-রেখে সুটকেসে রেখেছেন। সুটকেসগুলো তো আগেই জমা দেওয়া হয়ে গেছে, সেগুলো তো আর ওরা খুলে দেখবে না।

যাই হোক, সকলের সঙ্গে লাইন দিয়ে ওরাও সিঁড়ি দিয়ে প্লেনে উঠল। সিঁড়ির ঠিক ওপরে, একটি খুব সুন্দরী মেয়ে হাতজোড় করে প্রত্যেককে বলছে, নমস্কার। সন্তু জানে, এই মেয়েদের বলে এয়ার হস্টেস।

প্লেনের ভেতরটায় হালকা নীল রঙের আলো। মেঝেতে পুরু কর্পেট। সবাই এখানে খুব ফিসফিস করে কথা বলে। সন্তুর আর কাকাবাবুর পাশাপাশি দুটি সীটি। কাকাবাবু তাকে জানলার ধারের সীটটায় বসতে দিলেন। তারপর বললেন, দেখো, পাশে বেল্ট লাগানো আছে, তোমার কোমরে বেঁধে নাও।

সন্তু বেল্টটা খুঁজে পেল, কিন্তু ঠিক মতন লাগাতে পারল না। বেশ চওড়া নাইলনের বেল্ট, মোটেই সাধারণ বেল্টের মতন নয়। কাকাবাবু সেটা লাগাতে শিখিয়ে দিলেন। খোলা দিকটা খাপের মধ্যে ঢোকাতেই মট করে একটা শব্দ হয়। ও, এ-রকম বেল্ট বাঁধা থাকে বলেই বুঝি লোকেরা গড়িয়ে পড়ে যায় না?

তারপর কিন্তু আরও অনেকক্ষণের মধ্যে প্লেনটা ছাড়ল না। সবাই তো উঠে গেছে, দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে, তবু এত দেরি করছে কেন? সন্তু আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। জানলা দিয়ে এখন বাইরে দেখবার মতন কিছু নেই। এখানে মাটি নেই, সব জায়গাটাই শান বাঁধানো, সেখানে ঝকঝকি করছে রোদ।

সন্তু গলা উঁচু করে প্লেনের ভেতরের লোকজনদের দেখবার চেষ্টা করল। কতরকমের লোক, বাঙালি, মারোয়াড়ী, নেপালী, সাহেব-মোম, এমন-কী, একজন নিগ্রো পর্যন্ত আছে। সেই এয়ার হস্টেসটি একবার লোকজনদের গুনে গুনে গেল।

কাকাবাবু, এখনও ছাড়ছে না কেন?

কাকাবাবু উঠেই খবরের কাগজ পড়ায় মন দিয়েছিলেন। চোখ না তুলেই বললেন, সময় হলেই ছাড়বে!

এই সময় প্লেনের দরজা আবার খুলে গেল। একজন পুলিশ অফিসার ঢুকে ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ নিরিন্দর পাল সিং কে আছেন?

সামনের দিক থেকে একজন লম্বামতন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি। কেয়া হুয়া?

আপনার পাসপোর্টটা একবার দেখান তো?

আবার দেখাতে হবে? একবার তো দেখলাম?

আর একবার দেখান!

লোকটি পরে আছে ধুতির ওপরে লম্বা ধরনের প্রিন্স কোট। প্রথমে কোটের সবকটা পকেট খুঁজল। তারপর হাতব্যাগটা খুলে নিয়ে দেখল। তারপর আবার পকেট চাপড়াল। কোথাও পেল না।

লোকটি চেঁচিয়ে বলল, মেরা পাসপোর্ট কোউন লিয়া? পকেটমেই তো থা!

প্লেনের সব লোক ঐ লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটি তার পাসপোর্ট কিছুতেই খুঁজে পেল না। পুলিশ অফিসারটি গম্ভীরভাবে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে নেমে আসুন!

লোকটি প্রথমে আপত্তি করল খুব। তার খুব জরুরি দরকার আছে। তাকে যেতেই হবে। পাসপোর্ট তো তার সঙ্গেই ছিল, কী করে হারিয়ে গেল বুঝতে পারছে না।

পুলিশ অফিসারটি কিছুই শুনলেন না। লোকটিকে সঙ্গে করে নেমে গেলেন।

সন্তু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, পুলিশ কি লোকটাকে ধরে নিয়ে গেল?

পাসপোর্ট খুঁজে পেলে ছেড়ে দেবে।

যদি খুঁজে না পায়?

তা হলে যেতে দেবে না। এই দ্যাখ!

কাকাবাবু আঙুল দিয়ে খবরের কাগজের একটা জায়গা দেখালেন। সেখানে লেখা রয়েছে, পাসপোর্ট চুরি। কলকাতার বিভিন্ন জায়গা থেকে পাসপোর্ট খোয়া যাচ্ছে আজকাল। পুলিশের ধারণা, কোনও একটা জালিয়াতের দল কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই পাসপোর্ট চুরি করেছে-ইত্যাদি।

সন্তু ভাবল, ওরে বাবা, পাসপোর্ট জিনিসটা তাহলে এত দামি? হারিয়ে গেলে তাকেও এখন এই প্লেন থেকে নামিয়ে দিত? তাড়াতাড়ি কোটের বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল তার নিজেরটা ঠিক আছে কিনা।

সেদিন তাহলে সেই যে ছেলেটা তার পাসপোর্টটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটেছিল, সে কি চুরি করার চেষ্টা করছিল? সাহেবটা তাকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছিল কেন? সবাই বলে, সাহেবরা কখনও অভদ্র হয় না। হঠাৎ ধাক্কা লেগে গেলেও তারা সরি বলে ক্ষমা চায়। সেই সাহেবটা তো ক্ষমা চায়নি।

সন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকাল। উনি আবার খবরের কাগজ পড়ায় মন দিয়েছেন। সব সীটের পেছনের খাপে অনেকগুলো করে খবরের কাগজ রাখা থাকে।

একটু পরেই আবার প্লেনের দরজা বন্ধ হল। গোঁ গোঁ করে শব্দ হল ইঞ্জিনের। নরিন্দর পাল সিং আর ফিরে এল না। লোকটার জন্য একটু একটু দুঃখ হল সন্তুর। ইস, প্লেনে উঠেও লোকটার যাওয়া হল না!

এবার প্লেনটা মাটির ওপর দিয়ে দৌড়তে শুরু করল। প্রথমে আস্তে, তারপর খুব জোরে। দৌড়চ্ছে তো দৌড়চ্ছেই। কখন একসময় যে প্লেনটা মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ল, সন্তু টেরও পেল না। কোমরের বেল্টে একটু হ্যাঁচকাটান লাগিল না পর্যন্ত।

হঠাৎ সে দেখল, নীচের মানুষগুলো ছোট হয়ে আসছে। এয়ারপোর্ট আর নেই, তার বদলে গাছপালা, মাঠে গোরু চরছে, ফিতের মতন সরু রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। গাড়িগুলো সব খেলনার মতন, গোরুগুলো ঠিক যেন ছোট-ছেট মাটির পুতুল। রুপোলি ফিতের মতন একটা নদী। তারপর আর কিছু দেখা যায় না। সামনে তাকাতেই মনে হল কালো রঙের একটা বিশাল পাহাড়। প্লেনটা সোজা সেই দিকেই যাচ্ছে। কলকাতার এত কাছে পাহাড় কী করে এল? ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে পারল পাহাড় নয় মেঘ। কী ভয়ংকর ঐ মেঘের চেহারা!

কাকাবাবু এর মধ্যেই বিমোচ্ছেন। খুব ভোর রাতে উঠতে হয়েছে তো। কিন্তু বাইরে এত চমৎকার সব দৃশ্য, তা না দেখে কেউ ঘুমোতে পারে? হাস্কা-হাল্কা মেঘ উড়ে যাচ্ছে প্লেনের খুব কাছ দিয়ে। এক-এক জায়গায় মেঘ জমে আছে এমন অদ্ভুতভাবে যে, দেখলে মনে হয়, সাদা রঙের দুর্গ কিংবা একটা জঙ্গল।

প্লেনের ভেতরে ইঞ্জিনের দিকটায় এতক্ষণ লাল আলোয় দুটো লেখা জ্বলছিল। ধূমপান করবেন না। আর সিটবেল্ট বেঁধে রাখুন। এবার সেই আলো দুটো নিভে গেল। মাইক্রোফোনে একটা মেয়ের গলা শোনা গেল, নমস্কার। এই বিমানের ক্যাপ্টেন দিলীপকুমার দত্ত আর অন্যান্য কর্মীদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা তিন ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যে রেজুন পৌঁছোব। এখন আপনার সীটবেল্ট খুলে ফেলতে পারেন–

রেঙ্গুনে! সন্তুর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। তারা তাহলে রেঙ্গুন যাচ্ছে? রেঙ্গুন মানে বর্মা দেশ। প্যাগোডা। আর কী আছে। রেঙ্গুনে?

ঘোষণা শুনেই কাকাবাবু চোখ মেলে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, আমরা তাহলে রেঙ্গুন যাচ্ছি?

না।

কী আশ্চর্য ব্যাপার, সন্তু নিজের কানে শুনল যে, প্লেনটা রেঙ্গুনে যাবে, আর কাকাবাবু তবুও না বলছেন। এর মানে কী?

এবার সেই এয়ার হস্টেসটি একটা ট্রেতে করে কিছু লজেন্স এনে সবাইকে দিয়ে গেল। তারপর নিয়ে এল। চা আর কফি।

কাকাবাবু বললেন, এদের চা ভাল হয় না। কফিটাই খাও।

তারপর সন্তুর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, যদি বাথরুম পায়, বলতে লজ্জা পেও না। পেছন দিকে বাথরুম আছে।

সন্তুর বাথরুম পায়নি। কিন্তু প্লেনের বাথরুম কেমন হয়, তার খুব দেখতে ইচ্ছে করল।

এখন আর বাইরে দেখার কিছু নেই। শুধু মেঘ। তাই সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি একটু যাব।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, নিজে নিজে যেতে পারবে?

হ্যাঁ।

ঐ যে দেখছ, টয়লেট লেখা আছে, ঐখানে।

এত উঁচু দিয়ে দারুণ জোরে প্লেন যাচ্ছে, অথচ ভেতর থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ভেতরটা একদম স্থির। হেঁটে যেতে পাটলে যায় না।

সন্তু প্লেনের পেছন দিকে চলে গেল। তারপর বাথরুমের দরজা খুলবে, এমন সময় পাশের দিকে চোখ পড়ল। তার গা-টা একবার কেঁপে উঠল। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

একেবারে শেষের সীটটায় দুজন সাহেব বসে আছে। সন্তুর চিনতে কোনও অসুবিধে হল না, এর মধ্যে একজন হচ্ছে সেই সাহেবটা, যে পাসপোর্ট অফিসের সামনে সন্তুকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছিল! কাকাবাবুর কাছ থেকে সন্তু একটা জিনিস শিখেছে। একবার কারুকে দেখলে তার মুখটা সব সময় মনে রাখার চেষ্টা করতে হয়। সন্তু ঠিক মনে রাখতে পারে।

সাহেবটি অবশ্য আজ পোশাক বদলেছে। একটা খাকি প্যান্ট আর সাদা হাফ শার্ট পরে আছে। চার পাঁচ দিন দাড়ি কামায়নি। দেখলে খুব সাধারণ লোক মনে হয়। কিন্তু আগের দিন খুব সাজগোজ করা খাঁটি সাহেবের মতন দেখাচ্ছিল। নিশ্চয়ই ছদ্মবেশ ধরেছে। পাশের লোকটার পোশাকও সেইরকম। দুজনে খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে। সন্তুকে দেখতে পায়নি।

সন্তু বাথরুমের মধ্যে একটুখানি থেকেই বেরিয়ে এল। বাথরুমটা ছোট্ট, বিশেষ কিছু নতুনত্ব নেই।

ধীরে সুস্থে নিজের জায়গায় ফিরে এল। তারপর মুখ নিচু করে ফিসফিস করে বলল, কাকাবাবু, সেই সাহেবটা?

কোন সাহেবটা?

সেদিন পাসপোর্ট অফিসের সামনে যে আমায়–

সন্তু মাথা পেছন দিকে ঘুরিয়ে ওকে আবার দেখতে কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, ওদিকে তাকবি না। তোকে চিনতে পেরেছে?

না, আমায় দেখতে পায়নি।

কাকাবাবুদীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কিন্তু আমায় ঠিক চিনবে।

কথাটা ঠিক। কাকাবাবুর একটা পা কাটা। ক্রাচ নিয়ে চলতে হয়। এরকম লোককে একবার দেখলেই সবার মনে থাকে। সন্তুর মতন ছেলেমানুষকে হয়ত ঐ সাহেব দুটো লক্ষ করত না।

প্লেনের গতি কমে এল। আবার সীটবেল্ট বাঁধতে হবে। রেঙ্গুন এসে গেছে। সন্তু আবার নীচের দিকে তাকাল। ছবির মতন শহরটা দেখা যায়। এমন-কী, প্যাগোডার চুড়াও চোখে পড়ে।

রেঙ্গুনে কিন্তু যাওয়া হল না। প্লেন। এখান থেকে তেল নেবে। তাই এয়ারপোর্টে আধঘণ্টা বিশ্রাম। একটু বাইরে বেরিয়ে শহরটাও দেখে আসা যাবে না!

সব যাত্রীরা নেমে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে ঘোরাফেরা করছে। কাকাবাবু সন্তুকে একটা সোফা দেখিয়ে বললেন, এখানে চুপ করে বসে থাক। অন্য কোথাও যাবি না।

সেই সাহেব দুটো একটু দূরে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করছিল। কাকাবাবু ক্রাচে ঠিকঠক করে তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর হাতঘড়িটা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ঘড়িটা বোধহয় ঠিক চলছে না। আপনাদের ঘড়িতে কটা বাজে?

সাহেব দুটো একটু বিরক্ত হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। তারপর ঘড়ি দেখে অবহেলার সঙ্গে সময় বলে দিল।

সন্তু কাকাবাবুর সাহস দেখে অবাক। উনি নিজে থেকে ওদের দেখা দিতে গেলেন? ওরা যে খারাপ লোক তাতে তো আর কোনও সন্দেহই নেই। নইলে দাড়ি না-কামিয়ে কেউ প্লেনে চাপে?

খানিকটা বাদে কাকাবাবু ফিরে এসে বললেন, আবার প্লেনে উঠতে হবে।

আবার সীটবেল্ট বাঁধা, আবার বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা। এবার প্লেন বেশ তাড়াতাড়ি উড়ল। এবারে মাইক্রোফোনে মেয়েটি ঘোষণা করল, নমস্কার, আর দু ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যে আমরা পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছে যাবে, যদি ঝড়বৃষ্টি না হয়-

পোর্ট ব্লেয়ার? পোর্ট ব্লেয়ার জায়গাটা কোথায়? সিঙ্গাপুরে? জাপানে? নামটা একটু চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

কাকাবাবু, পোর্ট ব্লেয়ার কোথায়?

আন্দামানে।

তারপর একটু থেমে উনি বললেন, আমরা ঐখানেই নামব।

সন্তুর বুকটা দমে গেল। এত জল্পনা-কল্পনার পর শেষ পর্যন্ত আন্দামান? সেটা তো একটা বিচ্ছিরি জায়গা। সেখানে শুধু কয়েদীরা থাকে। সেখানে যাবার মানে কী?

সন্তু নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল গাঢ় নীল রঙের সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় শুধু সমুদ্র। মাঝে মাঝে জলের ওপর রোদ এমন ঠিকরে পড়ছে যেন চোখ কলসে যায়!

আন্দামান তো ভারতবর্ষের মধ্যেই। তবু সেখানে যাবার জন্য পাসপোর্ট জোগাড় করা কিংবা এত তোড়জোড় লাগে কেন? সাহেব দুটোই বা কেন সেখানে যাচ্ছে? কী আছে সেখানে?

আন্দামানের নাম শুনে সন্তু ভেবেছিল একটা নোংরামতন বিচ্ছিরি দ্বীপ দেখবে। যো-জায়গায় এক সময় শুধু চোর-ডাকাত আর কয়েদীদের পাঠানো হত, সে জায়গা তো আর সুন্দর হতে পারে না। আগেকার দিনে অনেকেই নাকি আন্দামানে একবার গেলে আর জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারত না। সেই জায়গায় কেউ শখ করে যায়?

৩. প্লেনটা ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল

কিন্তু প্লেনটা যখন ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল, তখন জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সন্তু একেবারে অবাক হয়ে গেল। ছবির বই ছাড়া এমন সুন্দর দৃশ্য সন্তু আগে কখনও দেখেনি। পুরী কিংবা দীঘার সমুদ্রে সে দেখেছে ঘোলাটে ধরনের জল। এখানে সমুদ্রের জল একেবারে গাঢ় নীল রঙের। এত গাঢ় যে, মনে হয়। কলম ডুবিয়ে অনায়াসে লেখা যাবে। তার মাঝখানে ছোট-ছেট দ্বীপ। আন্দামান তো একটা দ্বীপ নয়-সন্তুই গুনে ফেলল। এগারোটা। পরে শুনেছিল, ওখানে দুশোর বেশি দ্বীপ আছে।

প্রত্যেকটা দ্বীপেই ছোট-ছোট পাহাড় আছে, আর সেই পাহাড়ে গিসগিস করছে গাছপালা। এত গভীর বন যে পৃথিবীতে এখনও আছে, ভাবাই যায় না। মনে হয় যেন ওর মধ্য দিয়ে হাঁটাই যাবে না। বিরাট বিরাট গাছ। সেই নীল রঙের সমুদ্রের মধ্যে সবুজ সবুজ দ্বীপ, দ্বীপগুলোর ধারে ধারে ঢেউ এসে ভেঙে পড়ে ধপধাপে সাদা ফেনা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বেশির ভাগ দ্বীপেই একটাও বাড়িঘর নেই। তারপর একটা বড় দ্বীপে কিছু কিছু বাড়ি চোখে পড়ল। প্লেনটা সেখানেই নামছে। এই জায়গাটার নামই পোর্ট ব্লেয়ার। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেনটা মাটি ছুতেই সন্তু তার কাকাবাবুর দেখাদেখি কোমর থেকে সীটবেল্ট খুলে ফেলল। কান দুটো কী রকম যেন ভোঁভোঁ করছে। মাঝে মাঝেই পুচুপুচু করে একটু হাওয়া বেরিয়ে আসছে। কানের ভেতর থেকে। বাইরের শব্দ কিংবা ভেতরের অন্যদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে খুব আস্তে। বেশ মজাই লাগছে সন্তুর।

অন্যরা নামতে শুরু করতেই সন্তু তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। কাকাবাবু নামলেন সবার শেষে। কাকাবাবুকে ক্রাচে ভর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয় খুব সাবধানে। সন্তু একটু লজ্জা পেল। আগে আগে না এসে তার উচিত ছিল কাকাবাবুকে একটু সাহায্য করা। কিন্তু সে আবার সিঁড়ির কাছে যাবার আগেই কাকাবাবু নেমে পড়েছেন।

একজন গোলগাল বেঁটেমতন লোক এগিয়ে এসে কাকাবাবুর হাত ছুঁয়ে বলল, আপনি নিশ্চয় মিস্টার রায়চৌধুরী? আমি দাশগুপ্ত। আপনার জন্য গাড়ি নিয়ে এসেছি।

কাকাবাবু সন্তুকে দেখিয়ে বললেন, এটি আমার ভাইপো। এর নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী, ডাকনাম সন্তু।

দাশগুপ্ত নামের লোকটি সন্তুর পিঠে হাত দিয়ে বলল, বেড়াতে এসেছ তো? ভাল লাগবে, দেখো খুব ভাল লাগবে

কাকাবাবু দাশগুপ্তকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ঐ যে দুজন বিদেশি সাহেব, ওদের দিকে একটু নজর রাখতে হবে। ওরা কোথায় যায়, কোথায় ওঠে-

দাশগুপ্ত একটু অবাক হয়ে বলল, এই প্লেনে তো বিদেশি কেউ আসছে। না! আমরা আগে থেকেই খবর পাই।

কাকাবাবুজিজ্ঞেস করলেন, তাহলে ঐ দুজন? ওরা নিশ্চয়ই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এখানে একটা দেশলাইয়ের কারখানা আছে। সেখানে কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কাজ করে। মাঝে-মাঝে ওদের যাতায়াত করতে হয়। কলকাতায়-

তবু ওরা কোথায় থাকবে, সেটা আমি জেনে রাখতে চাই।

দাশগুপ্ত এবার হেসে বলল, সে ঠিক জানা যাবে। এটা খুব ছোট জায়গা, এখানে সকলের সঙ্গেই সকলের দেখা হয়ে যায়। ওরা নিশ্চয়ই দেশলাই কারখানার কোয়াটারেই থাকবে।

কাকাবাবু আড়চোখে সাহেব দুটির দিকে লক্ষ করতে লাগলেন। লোক দুটি এমনভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, যেন কারুকে খুঁজছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কোনও লোক আসেনি। একটু বাদে ওরা নিজেরাই গট গট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল।

মালপত্তর নিয়ে ওরা এয়ারপোর্টের বাইরে এসে একটা জিপ গাড়িতে চড়ল। কাকাবাবুজিজ্ঞেস করলেন, আমাদের থাকার জায়গা ঠিক আছে তো?

দাশগুপ্ত বলল, হ্যাঁ, টুরিস্ট হোমে আপনাদের ঘর বুক করা আছে। সেটাই এখানকার সবচেয়ে ভাল জায়গা! খাওয়া-দাওয়ারও কিছু অসুবিধে হবে না। বেশ কিছুদিন থাকবেন তো?

কাকাবাবু বললেন, দেখি!

প্লেন থেকে বোঝাই যায়নি যে দ্বীপের মধ্যে এ-রকম একটা শহর আছে। বেশ চমৎকার পীচ বাঁধানো রাস্তা, দুপাশে নতুন-নতুন বাড়ি ও দোকানপাট। তবে রাস্তাটা পাহাড়ি শহরের মতন উঁচু-নীচু, আর মাঝে-মাঝেই হঠাৎ হঠাৎ দূরে সমুদ্র দেখা যায়।

টুরিস্ট হোমটা একটা ছোট টিলার ওপর। আসবার পথে খনিকটা জঙ্গল পার হতে হয়। বাড়িটার সামনে অনেকখানি ফুলের বাগান। আর পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালেই সমুদ্র। খুব কাছে। এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট জাহাজ আর স্টিমার রয়েছে। চমৎকার জায়গা। যে-কোনও দিকে তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

একটা ডবল-বেড ঘর ঠিক করা ছিল সন্তুদের জন্য। একজন বেয়ারা ওদের মালপত্র পৌঁছে দিল ঘরে। কাকাবাবু তাকে এক টাকা বখশিস দিতে যেতেই সে লজ্জায় জিভা কেটে বলল, নেহি! নেহি।

কাকাবাবু আবার বললেন, আরে নাও নাও, তোমার চা খাবার জন্য!

লোকটি আরও লজ্জা পেয়ে মাথা নুইয়ে ফেলে বলল, নেহি! নেহি! আপ ব্রার্থ নিধি হা।

এ আবার কী রকম-হোটেলের বেয়ারা যে বখশিস নিতে চায় না? কাকাবাবু দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন, এক টাকা বখশিস দিলে কম হয় নাকি? আরও বেশি চাইছে?

দাশগুপ্ত বলল, না, না, এরা বখশিস নিতে চায় না। দেখবেন, এখানকার লোক খুব ভাল-পয়সা-কড়ির দিকে কারুর লোভ নেই।

লোকটির কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। চেহারা দেখলেই মনে হয় দক্ষিণ ভারতীয়। অথচ হিন্দীতে কথা বলছে।

কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? তুমি বাংলা বোঝে?

লোকটি বলল, হ্যাঁ সাব, বাংলা বুঝি। আমার নাম কড়াকড়ি?

সন্তু আমনি ফিক করে হেসে ফেলল। কড়াকড়ি আবার লোকের নাম হয় নাকি?

দাশগুপ্ত বলল, সত্যিই ওর নাম কড়াকড়ি। এই যে, শোনো কড়াকড়ি, সাহেবদের যত্ন-টত্ব করবে কিন্তু! ভাল খাবার-দাবার দেবে। আজি কী কী খাবার আছে?

কাকাবাবু বললেন, মাছের ঝোল ভাত পাওয়া যাবে?

দাশগুপ্ত বলল, মাছ যত ইচ্ছে চাইবেন। এটা তো মাছেরই দেশ। এখানকার রাধুনী, বেয়ারা সবাই কেরালার লোক, ওরা আমাদেরই মতন মাছের ঝোল খায়। চিংড়ি মাছ পাবেন খুব ভাল। তাছাড়া মুগী বা হরিণের মাংসযেদিন যেটা ইচ্ছা হয় অর্ডার করবেন?

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, তাহলে তো চমৎকার ব্যবস্থা!

দাশগুপ্ত তখনকার মতন বিদায় নিল। আবার সন্ধের সময় আসবে। সন্তু সুটকেসগুলো খুলে জামা-টামা সব বার করে গুছিয়ে রাখল। দুটো পাশাপাশি বিছানা, বেশ চওড়া খাট।

কাকাবাবু একটা খাটের ওপর বসে একটা ম্যাপ বিছিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। সন্তু পেছনের দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। পেছনেও খানিকটা বাগান, তারপর পাহাড়টা খাড়া হয়ে নেমে গেছে, তার ঠিক নীচেই সমুদ্র। একটু দূরেই, বা পাশে আর-একটা স্বীপ। সেটা একেবারে জঙ্গলে ভরা। ঐ দ্বীপটিায় একবার যেতেই হবে।

সন্তু দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ শুনতে পেল হাতির ডাক। পরপর দুবার। সে একেবারে শিউরে উঠল। এত কাছের ঐ দ্বীপটায় বুনো হাতি আছে? বাঘ-সিংহও আছে নিশ্চয়ই। এরকম একটা ভয়ংকর জঙ্গল এত কাছে? একটা দূরবীন থাকলে সে নিশ্চয়ই হাতিগুলোকে দেখতে পেত।

কিন্তু সন্তুর আর সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো হল না। কথা নেই বাতা নেই, অমনি বৃষ্টি এসে গেল! প্রথমে মিহি বরফের গুঁড়োর মতন, তারপরই ঝমোঝম। সন্তু দৌড়ে ফিরে এল নিজেদের ঘরে।

কাকাবাবু তখনও ম্যাপটা দেখছেন। সন্তু উত্তেজিতভাবে বলল, কাকাবাবু, কাকাবাবু, সামনের দ্বীপটায় না, হাতি আছে।

কাকাবাবু মুখ না তুলেই বললেন, তা তো থাকতেই পারে!

আমি হাতির ডাক শুনলাম। নিজের কানে, এক্ষুনি!

হুঁ।

ওখানে বাঘ বা সিংহ আছে? কাকাবাবু এবার মুখ তুলে বললেন, না! আন্দামানে কোনও হিংস্র জন্তু নেই। ঐ হাতিগুলোও পোষা হাতি। বড়বড় গাছ কাটা হয় তো, সেগুলো বয়ে নিয়ে যাবার জন্য হাতি লাগে। আমার চেনা এক ভদ্রলোক একবার কলকাতা থেকে পঞ্চাশটা হাতি নিয়ে এসেছিলেন এখানে।

পোষা হাতির কথা শুনে সন্তু একটু দমে গেল। পোষা হাতি আর বুনো হাতি দেখা তো আর এক নয়! যাই হোক, রিনিকে যখন সে চিঠি লিখবে, তখন লিখবে যে, সে বুনো হাতিরই ডাক শুনেছে। এত গভীর জঙ্গলের মধ্যে পোষা হাতিই বা দেখেছে কজন?

কাকাবাবু বললেন, সন্তু, ঐ লোকটিকে ডেকে এক কাপ চা দিতে বলো তো আমাকে। ভাত খাবার তো খানিকটা দেরি আছে?

এইরে, লোকটার নাম কী যেন? একটু আগেই তো বলল, একদম মনে পড়ছে না! গড়াগড়ি? খড়খড়ি? সুড়সুড়ি? কাতুকুতু? না তো! ধরাধরি? মারামারি?

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে সন্তু চেঁচিয়ে বলল, এই যে, ইয়ে! একটু শুনে যাও তো!

ভাগ্যিস তাতেই সাড়া দিল লোকটা। ডাইনিং রুমের পাশ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, কী বলছেন, সাব?

সন্তু তাকে চায়ের কথাটা জানিয়ে নিশ্চিন্ত হল। ওর নামটা কিন্তু এখনও মনে পড়ছে না!

আশ্চর্য, এর মধ্যেই বৃষ্টি থেমে গেছে। এ কী রকম ভালুকের জ্বরের মতন বৃষ্টি! আকাশে আর একটুকরোও মেঘ নেই।

ভোরবেলা সন্তু ছিল কলকাতায় তার নিজের বাড়িতে। আর এখন এই দুপুরের মধ্যেই সে কোথা চলে এসেছে! হঠাৎ যেন বিশ্বাসই করা যায় না। সত্যি কি সে আন্দামানের টুরিস্ট হোমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে? নাকি এটা স্বপ্ন? সন্তু নিজের হাতে একটু চিমটি কেটে দেখল, না, এটা স্বপ্ন নয়।

কাকাবাবুর আগে সন্তু স্নান করে নেবার জন্য বাথরুমে ঢুকল। সেখানে আবার এক অবাক কাণ্ড! শাওয়ার খুলে সে সবেমাত্র ওপর দিকে তাকিয়েছে, পাশের দেয়ালে দেখল একটা সবুজ রঙের টিকটিকি! প্রথমে সে ভেবেছিল সাপ বা অন্য কিছু। কিন্তু তা নয়। এমনিই একটি সাধারণ টিকটিকি। কিন্তু রঙটা একদম সবুজ। টিকটিকিটা তাড়া করে আসছেও না, কিছুই না। শুধু তার দিকে চেয়ে আছে। সবুজ রঙের টিকটিকির কথা সে কারুর কাছে কোনওদিন শোনেনি। সে এতই অবাক হয়ে গেল যে, আর চেপে রাখতে পারল না। ভিজে

গায়ে তোয়ালে পরেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল, কাকাবাবু, কাকাবাবু, একটা অদ্ভুত জিনিস!

সে এতই উত্তেজিত হয়ে বলল যে কাকাবাবু উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। টিকটিকিটা দেখে বললেন, আঁই, অদ্ভুতই বটে। এখানে এরকম আরও কিছু কিছু আছে, শুনেছি। এখানে সাদা রঙের কুমির দেখতে পাওয়া যায়।

সন্তু ভাবল, রিনিকে চিঠি লিখে চমকে দেবার আর একটা জিনিস পাওয়া গেল। গোয়াতে বেড়াতে গিয়ে ও কি এত সব নতুন জিনিস দেখতে পাবে!

সেদিন দুপুরে আর কোথাও বেরুনো হল না। খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম। এখানে সন্ধে হয় বেশ তাড়াতাড়ি। বিকেল হতে না হতেই সন্ধে।

সন্ধের সময় দাশগুপ্ত এল, তার সঙ্গে যাওয়া হল বাজারের দিকে। পোর্ট ব্লেয়ার বেশ আধুনিক শহর। এখানে টেলিফোন করে ডাকলেই ট্যাক্সি এসে যায়। বাজারে সবরকম জিনিসই। কিনতে পাওয়া যায়। অবশ্য সে-সব জিনিস কলকাতা কিংবা মাদ্রাজ থেকে আনা।

শহরে নানারকম লোক। বাঙালি, মাদ্রাজী, কেরালার লোক, পাঞ্জাবী, বিহারী, বর্মী। তবে বাঙালিই যেন বেশি মনে হয়। কিছু লোক আছে, যারা আগেকার কয়েদীদের বংশধর। তবে, দাশগুপ্ত বলল, এখানে এখন চুরি ডাকাতি একদম হয় না।

রাস্তার পাশে-পাশে বড়-বড় ব্যারাক বাড়িতে দেখা যায় কিছু চীনে মেয়ে-পুরুষ। তাদের নোংরা নোংরা জামা, কী রকম রাগ-রাগ চোখে তারা তাকায়।

কাকাবাবুজিজ্ঞেস করলেন, দাশগুপ্ত, এরাই বুঝি সেই তাইওয়ানিজ?

দাশগুপ্ত বলল, হ্যাঁ সার!

সন্তু ঠিক বুঝতে পারল না। সে জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, তাইওয়ানিজ মানে কী?

কাকাবাবুর বদলে দাশগুপ্তই বলল, তাইওয়ান বলে চীনেদের একটা ছোট্ট দেশ আছে। তাদের সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্ক নেই। সেই দেশ থেকে মাঝে মাঝে সাত-আটজন লোকসুদ্ধু এক-একটা মাছ ধরা নৌকো এখানে ভেসে চলে আসে। তাই তাদের ধরে আটকে রাখতে হয়?

কেন, তারা মাছ ধরতে আসে বলে তাদের ধরে রাখতে হয় কেন?

এক দেশের নৌকো তো আর-এক দেশে বিনা অনুমতিতে যাবার নিয়ম নেই। তাছাড়া ওরা শুধু মাছ ধরতে আসে, না গুপ্তচরের কাজ করতে আসে, সেটাও জানা দরকার।

কিন্তু ওদের বাড়ির দরজা-টিরজা তো সব খোলা। ওরা পালিয়ে যেতে পারে না আবার?

কী করে যাবে? ওদের নৌকো যে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সমুদ্র দিয়ে আর তো পালাবার কোনও উপায় নেই! ওদের মধ্যে যারা একটু বদমেজাজী, তাদের আটকে রাখা হয় জেলে।

দাশগুপ্ত এবার কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, স্যার, আপনি এখানকার জেল দেখতে যাবেন না? এখানকার বিখ্যাত জেল সবাই আগে দেখে। কবে যাবেন? কাল?

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, না। কাল সকালে আমার প্রথম কাজ হবে এখানকার দেশলাইয়ের কারখানাটা দেখতে যাওয়া। সেখানকার কারুর সঙ্গে আপনার চেনা আছে?

দাশগুপ্ত বলল, হ্যাঁ। অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার মিঃ। ভার্গবকে আমি ভালই চিনি।

কাল সকালেই সেখানে যাব।

পরদিন খুব সকালে উঠেই সন্তু তৈরি হয়ে নিল। তারপর কাকাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল হেঁটেই। সকালবেলা একটু হাঁটলে ভালই লাগে। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়েও হাঁটতে

ভালবাসেন। কিন্তু সুস্থির হয়ে হটবার কি উপায় আছে? মাঝে-মাঝেই হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি। তখন কোনও গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। অবশ্য দু-এক মিনিটের বেশি বৃষ্টি থাকে না।

দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বড় রাস্তায়। সে তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছিল। লোকটি বেশ বেঁটে ও মোটা, এত জোরে হটবার জন্য হাঁপাচ্ছিল। সে বলল, দেশলাইয়ের কারখানা অনেকটা দূর, সেখানে তো হেঁটে যাওয়া যাবে না। দাঁড়ান, এই রাস্তা দিয়ে বাস আসবে।

মিনিট পনেরো পরেই বাস এল। একদম ভিড় নেই। বাসের মাথায় লেখা আছে চ্যাথাম আয়ল্যাণ্ড। তার মনে বাসটা অন্য কোনও দ্বীপে যাবে! কী করে সমুদ্রের ওপর দিয়ে বাস যায়?

দেশলাইয়ের কারখানাটা পোর্ট ব্লেয়ার শহরের একেবারে এক প্রান্তে, বন্দরের কাছে। সেখানেই বাস থেকে নেমে পড়া হল, সামনেই কারখানার বড় গেট, আর ডান পাশে সমুদ্র।

কারখানার গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে কাকাবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর আপনমনে বললেন, সন্তুকে এখানে নিয়ে আসা ভুল হয়েছে। ওকে বাংলোতে রেখে এলেই হত

সন্তু একটু দুঃখ পেয়েও চুপ করে রইল।

দাশগুপ্ত বলল, কেন, চলুক না!

না, আমরা কারখানায় গিয়ে ম্যানেজার ট্যানেজারের সঙ্গে কথা বলব, সেখানে ও কী করবে? ছেলেমানুষ, ওর সেখানে থাকা উচিত নয়।

তা অবশ্য।

সন্তু, তুই আবার এখান থেকে বাস ধরে বাংলোয় ফিরে যেতে পারবি না? দাশগুপ্ত বাধা দিয়ে বলল, না, তার দরকার নেই। ও এখানেই একটু ঘুরে বেড়াক না। আন্দামানে ভয় তো কিছু নেই।

ভয়ের কথা বলছি না।

দাশগুপ্ত সন্তুকে বলল, তুমি সামনের দিকে একটু এগোলেই একটা ব্রীজ দেখতে পাবে, তার ওপারে চ্যাথাম আয়ল্যান্ড। সেখানটা ঘুরে এসো না।

কাকাবাবু, বললেন, সেই ভাল, সন্তু, তুই একটু বেড়িয়ে আয় এদিকটা, আবার ঠিক এখানে ফিরে আসবি।

ওরা কারখানার ভেতরে ঢুকে যাবার পর সন্তু সামনের দিকে এগুলো। একটুখানি যেতেই দেখল বাঁ দিকে সমুদ্রের ওপর একটা কাঠের ব্রীজ। তার ওপারে একটা পুঁচকি দ্বীপ। বড় জোর একটা ফুটবল মাঠের সমান।

ব্রীজটার ওপর পা দিয়ে সন্তুর কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। সমুদ্রের ওপর সেতু! রামায়ণে সেই রাম তাঁর বানর-সৈন্যদের নিয়ে সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন করেছিলেন। সেই কথা মনে পড়ে যায়। হোক না এটা ছোট সেতু, তবু দুটো দ্বীপের মাঝখানে তো, এবং তলায় আসল সমুদ্র।

জলের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। এখানে জলের রঙ আর ঘন নীল নয়, কাচের বোতলের মতন হালকা সবুজ। তার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে মাছ, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। অনেক মাছই রঙিন, লাল, সবুজ, হলুদ, ময়ুরুকণ্ঠী—মনে হয় গোটা সমুদ্রটাই যেন একটা অ্যাকোয়ারিয়াম! স্ত্রীজের কাঠের খুঁটির গায়ে-গায়ে লেগে আছে কাঁকড়া-সেগুলোর একটাও সাধারণ কাঁকড়ার মতন খয়েরি নয়, মাছগুলোর মতনই নানা রঙে রঙিন।

সন্তু কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে মাছেদের খেলা দেখছিল, আবার বৃষ্টি এসে গেল। সে দৌড়ে চলে গেল ব্রীজের ওপারে। চ্যাথাম দ্বীপটিতে বড়-বড় গুদাম ভর্তি কাঠ, এক জায়গায় কাঠ চেরাই হচ্ছে। দ্বীপটার অন্যদিকে রয়েছে। কয়েকটা বড়-বড় জাহাজ। কোনওটার নাম এস এস হরিয়ানা, কোনওটার নাম চলুঙ্গা, কোনওটার নাম গঙ্গা। সেখানে কোনও লোকজন নেই। একটু দূরে দেখা যায় সমুদ্রের ওপর কয়েকটা মাছ ধরা নৌকো।

সন্তু সবচেয়ে বড় জাহাজটার খুব কাছে গিয়ে সেটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। সে কোনওদিন জাহাজে চাপেনি। ফেরার সময় নিশ্চয়ই জাহাজে করে ফেরা হবে! কিন্তু কবে ফেরা হবে?

হঠাৎ সন্তুর মনে হল, সে অনেক দেরি করে ফেলেছে। কাকাবাবুদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, তার জন্যই দাঁড়িয়ে আছেন। সে তাড়াতাড়ি ব্রীজ পেরিয়ে আবার ফিরে এল ওপরে।

কাকাবাবু আর দাশগুপ্ত ঠিক তখুনি বেরিয়ে এলেন কারখানার গেট দিয়ে। কাকাবাবুর মুখ গম্ভীর। থমথমে। ক্রাচের খটখট শব্দ তুলে তিনি এগিয়ে গেলেন সমুদ্রের দিকে। একদম কিনারার কাছে থেমে দূরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা হাত বোলাতে লাগলেন গোঁফের ওপরে।

সন্তু ফিসফিস করে দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করল, সেই সাহেব দুজনকে পাওয়া গেছে?

দাশগুপ্ত মাথা নাড়িয়ে জানোল, না।

তারা এখানে আসেনি তাহলে?

উঁহু! গত দু মাসের মধ্যে এখানকার কেউ বাইরে যায়নি। নতুন কেউ আসেওনি। এখানে মাত্র তিনজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাজ করে। তাদের দেখলাম, তারা অন্য লোক!

তবে সেই সাহেব দুজন নিশ্চয়ই অন্য কোনও হোটেলে আছে।

এখানে সাহেবদের থাকার মতন কোনও হোটেল নেই। ওরা যদি বিদেশি হয়, তাহলে তো আরও মুশকিল! কোনও বিদেশিই আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে এখানে আসতে পারে না!

দাশগুপ্ত কাকাবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, স্যার, আপনি চিন্তা করবেন না, ওদের ঠিক খুঁজে বার করা যাবে। এইটুকু ছোট জায়গা, এখানে ওরা পালাবে কোথায়?

কাকাবাবু মুখটা ফিরিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, এখানে অনেক দ্বীপ আছে, তার যে-কোনও একটাতে গিয়ে লুকিয়ে থাকা তো খুব সোজা?

কিন্তু এখানে এসে তাদের লুকিয়ে থেকে কী লাভ? কী আর এমন আছে এখানে?

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অনেকটা আপনমনেই বললেন, আছে। কারণ আছে। সেইজন্যই তো আমিও এসেছি এখানে।

এই সময় চ্যাথাম দ্বীপের পেছন দিক থেকে ভট্টভট্ট শব্দে একটা মোটরবোট বেরিয়ে এল। মোটরবোটটা ছোট, ঠিক একটা হাঙরের মতন দেখতে। সেটা সমুদ্রের জল কেটে খুব জোরে ছুটে যেতে লাগল দূরের দিকে। এতদূর থেকেও সন্তুরা স্পষ্ট দেখতে পেল, সেই বোটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দুজন সাহেব। কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, দাশগুপ্ত, দাশগুপ্ত, একটা মোটরবোট জোগাড় করতে পারো? এক্ষুনি?

দাশগুপ্ত অবাক হয়ে বলল, মোটরবোট? কেন, আপনি কি ওদের তাড়া করবেন নাকি?

কাকাবাবু অধৈর্য হয়ে প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, আঃ, জোগাড় করতে পারবে কিনা বলো না! ওরা একবার লুকিয়ে পড়লে আর ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে না! এই তো ব্রিজের পাশে একটা খালি মোটরবোট রয়েছে, এটা ব্যবহার করা যায় না?

দাশগুপ্ত বলল, না, স্যার। এখানে পুলিশের অনুমতি ছাড়া কেউ বোট চালাতে পারে না। আমি পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে আপনার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারি-

সে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।

কাকাবাবু হতাশভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাহেবদের মোটরবোট ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। তারপর একটা দ্বীপের আড়ালে বাঁক নিতেই সেটাকে আর দেখা গেল না।

কাকাবাবু নিজের বাঁ হাতের ওপর ডান হাত দিয়ে একটা ঘুষি মারলেন। তারপর বললেন, এটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল যে, ওরা ঠিক লুকোবার চেষ্টা করবে। এখানে লুকিয়ে থাকা খুব সহজ! ওরা যে বোটটা নিয়ে গেল, সেটা কার বোট, কোনও অনুমতি নিয়েছে কিনা–এ খবর জোগাড় করতে পারবে?

দাশগুপ্ত বলল, তা পারব। হারবার মাস্টারের কাছেই খোঁজ পাওয়া যাবে।

তবে এক্ষুনি সেই খবর নিয়ে এসো।

দাশগুপ্ত একটুক্ষণ তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু চিন্তা করার সময় লোকটির একটা চোখ ট্যারা হয়ে যায়। ট্যারা চোখে জলের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল, এক কাজ করুন, স্যার। আপনি টুরিস্ট হোমে ফিরে যান। ব্রেকফার্স্ট খেয়ে নিন। ততক্ষণে আমি সমস্ত খবর নিয়ে আপনার কাছে আবার যাচ্ছি। দিল্লি থেকে আমার কাছে অর্ডার এসেছে আপনাকে সব রকমে সাহায্য করার জন্য। তবে আপনি কোন রহস্যের খোঁজে এসেছেন, তা কিন্তু আমি এখনও জানি না।

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, একটু বাদে তুমি যখন টুরিস্ট হোমে আসবে, তখন তোমাকে সব বলব। চলো, সন্তু!

৪. কাছেই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল

কাছেই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। বাসের জন্য অপেক্ষা না করে ওরা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

টুরিস্ট হোমে একটা মস্ত বড় ডাইনিং হল আছে। সকলে সেখানে গিয়েই খাবার-টাবার খায়। দুরের সমুদ্র আর পাহাড় দেখতে দেখতে খাওয়া যায়।

ডাইনিং হলে তখন কয়েকজন লোক বসে ছিল। কাকাবাবু বেশি লোকজন পছন্দ করেন না। তিনি সন্তুকে বললেন, আমাদের বেয়ারকে বলে দাও, আমার খাবারটা আমার ঘরে দিয়ে যেতে।

এই রে, সন্তু আবার বেয়ারটার নাম ভুলে গেছে। এমন অদ্ভুত নাম, মনে রাখাই যায় না। কী যেন ওর নাম, হুটোপটি? খিটিমিটি? ঝুমঝুমি? গুংগাংগুলা? টুংগাটুলা? ধুৎ! এরকম আবার নাম হয় নাকি কারুর। অথচ এই রকম সব কথাই মনে আসছে। কিড়ি মিড়ি? ধাই ধপাস?

সন্তু আবার ডাকতে লাগল, ইয়ে! এই যে ইয়ে, শুনে যাও তো!

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল বেয়ারাটি। সন্তু তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, তোমার নামটা যেন কী বলেছিলে?

লোকটি এক গাল হাসল। হাসলে তাকে অদ্ভুত দেখায়। কারণ তার একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, অন্য সব দাঁত ধপধাপে সাদা, একটা দাঁত সোনালী।

সে বলল, সাব, আমার নাম কড়াকড়ি?

কড়াকড়ি, ও কড়াকড়ি! হ্যাঁ, তাই তো! আচ্ছা কড়াকড়ি, তুমি আমাদের খাবারটা আমাদের ঘরে দিয়ে যাও!

এখনি দিচ্ছি। সাব, একটা বরিয়া চিজ দেখবেন?

কী?

আসুন আমার সঙ্গে!

ডাইনিং হলের ডানপাশে একটা ছোট বাগান। তারপর পাহাড়টা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সমুদ্রে। বাগানের এক কোণে একটা গাছের সঙ্গে একটা অদ্ভুত জন্তু বেঁধে রাখা হয়েছে। সেটা মস্ত বড় একটা কচ্ছপের মতন, কিন্তু গোটা কাঁকড়ার মতন। কড়াকড়ি ধরে ধরে টানতেই সেটা ক্রোক করে একটা রাগী আওয়াজ বার করল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, এটা কী?

এটা একটা ক্র্যাব, সাব! ক্র্যাব!

ক্র্যাব? তার মানে কাঁকড়া? এত বড়? কাঁকড়া আবার ডাকে নাকি?

হা, সাব! আজি এটা রান্না করে আপনাদের খাওয়াব! ক্র্যাব খান তো? এ রকম একটা অদ্ভুত জিনিস নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে দেখানো উচিত। সন্তু দৌড়ে গিয়ে কাকাবাবুকে ডেকে নিয়ে এল।

কাকাবাবুও চমকে গেলেন। কাছে গিয়ে ঝুঁকে ভাল করে দেখে বললেন, হুঁ, নাম শুনেছি! এগুলোকে বলে কোকোনাট রবার! এরা নারকেল গাছে উঠে নারকোল ভেঙে খায়, এদের গায়ে এত জোর!

কড়াকড়ি বলল, হাঁ সাব। এরা কোকোনাট খায়।

এটাকে ধরলে কী করে? এদের দাঁড়ায় তো খুব জোর?

একটা পাথর দিয়ে মেরে উল্ট করে দিয়েছিলাম?

ইস, ছিছি, এরকম একটা প্রাণীকে মারতে আছে? এগুলো খুব রেয়ার, মানে খুব কম পাওয়া যায়। এরকমভাবে মারলে পৃথিবী থেকে একদিন এরা শেষ হয়ে যাবে।

সন্তু বলল, কাকাবাবু, কড়াকড়ি বলছে, এটা আজ ও আমাদের রান্না করে খাওয়াবে।

কাকাবাবু দারুণ আপত্তি করে বললেন, না, না, না! এটাকে মারা উচিত ময়। এটাকে এক্ষুনি ছেড়ে দাও। তোমাকে আমি পয়সা দিয়ে দেব!

কড়াকড়ি খুব অনিচ্ছার সঙ্গে একটা ছুরি এনে দড়িটা কেটে দিল। কাঁকড়াটা তার গুলিগুলি চোখ নিয়ে ওদের দিকে তাকাল। তারপর পেটের নীচ থেকে ধার করল তার দুটো দাঁড়া। প্রায় মানুষের হাতের মতন মোটা।

কাকাবাবু বললেন, সাবধান, সরে দাঁড়াও, সন্তু! ঐ দাঁড়া দিয়ে একবার চিমটে ধরলে আর কিছুতেই ছাড়ানো যাবে না?

কাঁকড়াটা দুবার ক্রোক ক্রোক শব্দ করল। তারপর হঠাৎ একটা মাকড়শার মতন তরতর করে নেমে গোল ঢালু জায়গাটা দিয়ে।

ওরা ফিরে এল নিজেদের ঘরে। খাবার খেয়ে নেবার পর কাকাবাবু তিন-চারখানা বই একসঙ্গে খুলে তার মাঝখানে একটা ম্যাপ বিছিয়ে নিয়ে বসলেন। সন্তুকে বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে এখন একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আসতে পারো।

সন্তুর একটুও যাবার ইচ্ছে নেই। একটু পরেই দাশগুপ্তবাবু আসবেন, কাকাবাবু তাঁকে বলবেন যে, কোন রহস্যের সন্ধানে তিনি এখানে এসেছেন। সেটা সন্তুকে শুনতে হবে না?

কাকাবাবু তো নিজের থেকে তাকে কিছুই বলবেন না। সন্তুও টেবিলে একটা বই খুলে বসে রইল।

একটু বাদে হাওয়ার ঝাপটায় কাকাবাবুর ম্যাপটা উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে। সন্তু তাড়াতাড়ি সেটা তুলে কাকাবাবুকে দিতে গেল।

কাকাবাবুজিজ্ঞেস করলেন, তুমি ম্যাপ কী করে দেখতে হয় জানো?

সন্তু বলল, হ্যাঁ, জানি। ম্যাপের ওপর দিকটা সব সময় উত্তর দিক হয়। কাকাবাবু হাসলেন। বললেন, তা তো হয়! এই যে দেখো, ভারতবর্ষের ম্যাপে, নীচের দিকে সমুদ্রের মধ্যে যে দু-একটা কালির ছিটের মতন থাকে, সেইগুলোই হচ্ছে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। এখানে সেই দ্বীপগুলোরই আলাদা করে বড় ম্যাপ আঁকা হয়েছে। এই যে লম্বা মতন বড় দ্বীপটি দেখছ, সেটা আসলে তিনটে দ্বীপ-এদের নাম হচ্ছে নর্থ আন্দামান, মিডল আন্দামান আর সাউথ আন্দামান। এই দ্যাখো, সাউথ আন্দামানের পেটের কাছে পোর্ট ব্লেয়ার-এইখানে আমরা আছি। আরও কয়েকটা দ্বীপের নাম নীল, হ্যাভলক, রস–এগুলো সব এক-একজন সাহেবের নামে। সাহেবরা আসবার আগে এই দ্বীপগুলো ছিল জলদস্যুদের আড্ডা!

জলদস্যুদের কথা শুনেই সন্তু চমকে উঠল। জলদস্যু-তার মানেই গুপ্তধন-ট্রেজার আয়ল্যান্ড বইটার গল্পের কথা মনে পড়ল। তাহলে কি কাকাবাবু এখানে গুপ্তধনের সন্ধানে এসেছেন? কাকাবাবু সব সময় পুরনো ইতিহাস-বই পড়তে ভালবাসেন। হয়তো সেই রকম কোনও বইতে এখানকার গুপ্তধনের কথা আছে।

কাকাবাবু বলতে লাগলেন, এদিককার সমুদ্র দিয়ে যে-সব জাহাজ যেত, জলদস্যুরা হঠাৎ এসে আক্রমণ চালাত সেগুলোর ওপর। একটা পর্তুগীজ জাহাজ তো আগুন দিয়ে পুড়িয়েই দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জলদস্যুদের দমন করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার এখানে একটা ঘাঁটি তৈরি করবে। ঠিক করল। কিন্তু জলদস্যুরা ছাড়াও এখানে আর-একটা বিপদ ছিল।

এই সব দ্বীপগুলোতে তখন ভর্তি ছিল হিংস্র আদিবাসী-বাইরের লোকজন দেখলেই তারা আক্রমণ করত।

সন্তু আর মনের কথাটা চেপে রাখতে পারল না। হঠাৎ বলে ফেলল, কাকাবাবু, এখানে গুপ্তধন নেই?

কাকাবাবু অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকালেন, গুপ্তধন? কিসের গুপ্তধন?

জলদস্যুরা যে অনেক সোনা আর হীরে-মুক্তো লুকিয়ে রাখত দ্বীপের মধ্যে? যদি এখানেও সেরকম রেখে থাকে-তারপর সেই জলদস্যুরা মরে গেছে-সেগুলোর কথা আর কারুর মনে নেই...

কাকাবাবু হেসে চশমাটা খুললেন। তারপর বললেন, ওসব তো গল্পের বইতে থাকে-আজকাল কি আর সত্যি সত্যি কেউ গুপ্তধন পায়?

আমরা যদি চেষ্টা করে পেয়ে যাই?

এমনি-এমনি চেষ্টা করলেই যদি গুপ্তধন পাওয়া যায়-তাহলে তো অনেকেই আগে পেয়ে যেত। শোনো, হঠাৎ টাকা-পয়সা পেয়ে বড়লোক হয়ে যাবার লোভ করতে নেই। টাকা রোজগার করতে হয় নিজে পরিশ্রম করে কিংবা বুদ্ধি খাটিয়ে। যাক ওসব বাজে কথা-শোনো, যা বলছিলাম, এই যে ম্যাপের মধ্যে অনেক ছোট-ছেট ফোঁটা দেখছ, এগুলোও এক-একটা দ্বীপ-আরও অনেক ছোট-ছোট দ্বীপ আছে, যা ম্যাপেও নেই-এর মধ্যে অনেক দ্বীপেই মানুষ থাকে না। মানুষ কখনও যায়ও না-শুধু পাহাড় আর জঙ্গল-সেই রকম কোনও একটা দ্বীপে যদি কয়েকজন সাহেব লুকিয়ে থাকে, কেউ তাদের খুঁজে বার করতে পারবে?

কিন্তু সাহেবরা সেখানে লুকিয়ে থাকবে কেন? তাদের কী লাভ?

কাকাবাবু উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দরজার বাইরে কার পায়ের শব্দ হল। কাকাবাবু থেমে গেলেন।

পদ। সরিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করল, আসব স্যার?

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো। বলো, কিছু খবর পেলে? দাশগুপ্তর মুখখানা লালচে হয়ে গেছে। অনেকখানি রাস্তা সে যেন দৌড়ে এসেছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বলল, বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার। আমরা আজ নিজের চোখে দেখলাম একটা মোটরবোট চ্যাথাম দ্বীপের পাশ দিয়ে সমুদ্রে চলে গেল, অথচ হারবার মাস্টার বললেন, আজ সকালে কোনও বোটই যায়নি!

কাকাবাবু বললেন, তার মানে?

দাশগুপ্ত একটা চেয়ারে ধাপ করে বসে পড়ে বলল, ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। এখানে অনেক রকম মোটরবোট আর স্টিমার আছে। কোনওটা যাত্রী নিয়ে যায়, কোনওটা মালপত্র, কোনওটা মাছ ধরার কিংবা ঝিনুক তোলার-তাছাড়া আছে পুলিশের বোট–সবগুলোর নাম রেজিষ্টি করা আছে, কোনটা কোন সময় ছাড়ে বা ফিরে আসে তা লিখে রাখতে হয়। এখন হারবার মাস্টার বললেন, আজ খুব সকালে একটা শুধু যাত্রী-জাহাজ ছেড়েছে, আর কোনও বোটই ছাড়েনি। এমন কী, অন্য সব বোট কোনটা এখন কোথায় আছে, তারও হিসেব মিলে যাচ্ছে। সুতরাং সকাল আটটার সময় আর কোনও বোট যেতেই পারে না।

কাকাবাবু রেগে উঠে বললেন, যেতেই পারে না মানে? তাহলে যেটা দেখলাম, সেটা কী?

দাশগুপ্ত বলল, আমিও তো সেই কথাই বললাম। আপনি দেখেছেন, আমি দেখেছি, সন্তু দেখেছে, আরও কয়েকজন দেখেছে। তাহলে বলতে হবে, একটা আলাদা মোটরবোট বেশি ছিল এখানে, যার খোঁজ কেউ রাখে না। সেটা কী করে সম্ভব?

কাকাবাবু বললেন, খুবই সহজে সম্ভব। ঠিক আর-একটা মোটরবোটের মতন একই রকম চেহারা করে আর নাম লিখে কেউ একটা জাল বোট রেখেছিল এখানে। সেই জাল বোটটাই সাহেবদের নিয়ে পালিয়েছে। তুমি পুলিশকে এ খবর জানিয়েছ?

হ্যাঁ, স্যার, জানিয়েছি। পুলিশ আপনার কাছেও আসবে। স্যার, পুলিশ আপনার পরিচয়টাও জানতে চাইছিল।

কাকাবাবু একটা চুরুট ধরলেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আমার পরিচয় বিশেষ কিছু নেই। আমি এক সময় ভারত সরকারের একটা চাকরি করতাম। একটা দুর্ঘটনায় আমার একটা পা নষ্ট হয়ে যাবার পর আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু তারপর শুধু খেয়ে আর শুয়ে দিন কাটিয়ে দিই না। আমি কিছু কিছু রহস্য সমাধানের চেষ্টা করি। এগুলো সাধারণ খুনটুনের সমস্যা নয়। পৃথিবীতে এমন কতকগুলো রহস্যময় ব্যাপার আছে, যার সমাধান মানুষ এখনও করতে পারেনি। যেমন ধরো, সাংহাইয়ের বাজারে অনেকদিন আগে একটা লোক নানারকম জড়িবুটি, পশুপাখির হাড়, শেকড়বাকড় এই সব বিক্রি করত। একবার তার দোকানে দুটো দাঁত পাওয়া গেল, যে-দুটো মানুষের দাঁত ছাড়া অন্য কারুর হতেই পারে না। কিন্তু সেই দাঁত দুটো ছিল এক ইঞ্চি করে লম্বা। অত বড় দাঁত আজ পর্যন্ত কেউ কোনও মানুষের দেখেনি। অন্তত দশ-বারো ফুট লম্বা মানুষের অত বড় দাঁত থাকতে পারে। অত লম্বা মানুষ কি কখনও পৃথিবীতে ছিল? সব বৈজ্ঞানিকই বলছেন, মানুষ অত লম্বা কিছুতেই হতে পারে না। তাহলে দাঁত দুটো কোথা থেকে এল? দাঁত দুটো তো ভেজাল নয়-অনেক পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সে-দুটি খাঁটি মানুষের দাঁত। এই দাঁতের রহস্যের মীমাংসা আজও হয়নি।

দাশগুপ্তর মুখখানা হা হয়ে গেছে, তার সব কটা দাঁত দেখা যাচ্ছে, একটা চোখও ট্যারা হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে, সে খুবই অবাক হয়ে গেছে। সাহেব আর মোটরবোটের সঙ্গে এক ইঞ্চি লম্বা দুটো দাঁতের যে কী সম্পর্ক সে বুঝতেই পারছে না। সন্তুও বুঝতে পারেনি।

কাকাবাবু আবার বললেন, দক্ষিণ আমেরিকার একটা জায়গায় কতগুলো বিরাট বিরাট পাথরের বল আছে। বলগুলো কত বড় জানো? একটা মানুষের চেয়েও বড়-সেই একটা বল এই ঘরের দরজা দিয়েও ঢুকবে না-বলগুলো পাথরের হলেও নিখুঁত গোল আর চকচকে-সেগুলো মাঠেঘাটে ছড়ানো আছে-এখন রহস্য হচ্ছে, কে বা কারা অত বড় বড় বল তৈরি করেছিল, কেনই বা করেছিল? ঐ রকম বল দিয়ে তো আর ফুটবল খেলা যায় না! মানুষ এর রহস্যটা আজও জানতে পারেনি! তারপর ধরো, সম্রাট কণিষ্কের মূর্তিতে কেন মুণ্ডুটা নেই, কোথাও তার মুখের কোনও ছবি নেই কেন, সেটাও একটা রহস্য। আমি এরকম রহস্য সমাধানের চেষ্টা করি। কিছু একটা টের পেলে আমি ভারত সরকারকে চিঠি লিখে জানাই-সরকার তখন আমাকে নানা রকম সাহায্য দেয়। এ-সব কথা তোমাকে বললাম বটে, তবে তুমি বেশি লোককে আমার কথাঁ ছাংৎি3 না।

কাকাবাবু একটু থেমে আবার চুরুট টানতে লাগলেন। দাশগুপ্ত আর সন্তু দারুণ কৌতূহলীভাবে চেয়ে রইল। তাঁর দিকে।

কাকাবাবু বললেন, এবার তোমরা জানতে চাইতে পারো, এখানে আমি কোন রহস্য সমাধানের জন্য এসেছি! এজন্য আন্দামানের ইতিহাসটা একটু জানা দরকার। ইংরেজরা মাত্র শদেড়েক বছর আগে এখানে এসেছিল বটে, কিন্তু তারও অনেক আগে অনেকের লেখায় এই দ্বীপের উল্লেখ আছে। এমন-কী, প্রায় দেড় হাজার বছর আগে একজন ভ্রমণকারী এই দ্বীপগুলোর পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আন্দামানের নাম দিয়েছিলেন সোনার দ্বীপ। আরও অনেকে এটাকে সোনার দ্বীপ বলেছে। কেন? এ-দ্বীপগুলোর কোথাও তো সোনা পাওয়া যায় না? তবু সোনার দ্বীপ নাম দেওয়া হয়েছিল কেন? তারপর ধরো, এই দ্বীপের যে আদিবাসী, তাদের মাথার চুল নিগ্রোদের মতন কোঁকড়া কোঁকড়া। এটাই বা কী করে হল? ভারত কিংবা বীমা কিংবা ইন্দোনেশিয়া-যেগুলো এর কাছাকাছি দেশ, সেখানকার লোকদের মাথার চুল তো এরকম নয়! তাহলে এই লোকগুলো এল কোথা থেকে? এটা রহস্য নয়?

দাশগুপ্ত আস্তে আস্তে বলল, তা বটে। এগুলো রহস্যই বটে!

কাকাবাবু বললেন, কিন্তু আমি এ-সব রহস্য সমাধানের জন্যও আসিনি! আমি এসেছি অন্য কারণে

কাকাবাবু উঠে গিয়ে সুটকেস থেকে একটা ফাইল আনলেন। তার মধ্যে অনেক পুরনো খবরের কাগজের পাতা কেটে-কেটে জমিয়ে রাখা আছে। সেগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে তিনি বললেন, এই যে দ্যাখো, এটা অনেকদিন আগেকার কথা, উনিশশো পাঁচশ সাল, তার মানে একান্ন বছর আগে, ডক্টর স্পিরনভ নামে একজন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। তারপর তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কেউ আর তাঁর খোঁজ পায়নি। অনেকের ধারণা, তিনি জলে ডুবে মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর দেহটাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি খুব নামকরা লোক ছিলেন। তারপর দ্যাখো এটা-উনিশশো সাঁইত্রিশ সাল-পোল্যাণ্ড থেকে এসেছিলেন দুজন বৈজ্ঞানিক, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম শুধু কাগজে ছাপা হয়েছিল, মিঃ জারজেসকি আর তাঁর সঙ্গী, এঁরাও দুজনে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তারপর উনিশশো একচল্লিশ সালে আবার রাশিয়া থেকে এলেন অধ্যাপক জুসকভ, ইনিও নিরুদ্দেশ। এঁর বেলায় খুব হৈচৈ হয়েছিল। জাহাজ নিয়ে সমুদ্রেও খোঁজাখুঁজি হয়েছিল। তবু পাওয়া যায়নি। এরপর উনিশশো তিপ্পান্ন সালে আবার দুজন, সাতান্ন সালে একজন, উনিশশো চৌষট্টি সালে একসঙ্গে তিনজন বৈজ্ঞানিক উধাও হয়ে যান। পুরনো খবরের কাগজ থেকে আমি এগুলো বার করেছি। কেন একসঙ্গে এতগুলি বৈজ্ঞানিক এই জায়গায় এসে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে?

দাশগুপ্ত তাড়াতাড়ি বলল, স্যার, এর দু-একটা ঘটনা আমিও শুনেছি। তবে এ-রহস্যের মীমাংসা করা তো শক্ত নয়। এ-সব ব্যাপার তো পুলিশও জানে। আপনি জারোয়াদের কথা শুনেছেন?

কাকাবাবু বললেন, শুনেছি।

আন্দামানের দ্বীপগুলোতে পাঁচ ধরনের আদিবাসী ছিল এক সময়। এর মধ্যে অন্যরা শান্ত হয়ে গেলেও দুটো জাত খুবই হিংস্র। এরা হচ্ছে সেন্টিনেলিজ আর জারোয়া।

সেন্টিনেলিজরা থাকে অনেক দূরে, আলাদা একটা দ্বীপে। জারোয়ারা কিন্তু কাছেই থাকে– দক্ষিণ আর মধ্য আন্দামানের গভীর বনের মধ্যে। এই জারোয়ারা সাঙ্ঘাতিক হিংস্র; সভ্যলোক দেখলেই খুন করে। সাধারণ লোক কেউ ওদের এলাকায় যায় না। সাহেবদের তো সাহস বেশি হয়, তারা ঐ জঙ্গলে ঢুকেছে আর জারোয়াদের বিষ-মাখানো তীর খেয়ে মরেছে! এ তো খুব সোজা ব্যাপার। ভেবে দেখুন স্যার, জারোয়ারা এমন দুদন্তি যে, পুলিশ পর্যন্ত ওদের ধার ঘেঁষে না। এমন-কী, ওদের সংখ্যা যে কত তা গোনা পর্যন্ত যায়নি।

কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, না, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। কয়েকটা লোক খুন হয়েছে বা নিরুদ্দেশ হয়েছে, সে খোঁজ নিতেও আমি আসিনি। সে তো পুলিশের কাজ। রহস্য হচ্ছে, এইসব বৈজ্ঞানিকরা এখানে এসেছিল কেন? প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু বৈজ্ঞানিক এখানে এসেছে খুন হবার জন্য বা নিরুদ্দেশ হবার জন্য? বৈজ্ঞানিকরা এত বোকা হয় না। তারা এসেছিল নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্যটা যে কী, তা এখনও জানা যায়নি। আমি এসেছি সেটা জানতে।

দাশগুপ্ত চেঁচিয়ে বলে উঠল, তাহলে এই যে সাহেব দুটো–

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, এবার ঠিক ধরেছ। এই সাহেব দুটোরও নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে। শুধু এই দুজন কেন, আমার ধারণা আরও কয়েকজন এসেছে এর মধ্যে, তারা কোথাও লুকিয়ে আছে।

ফাইলটা মুড়ে রেখে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের জন্য লঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে?

দাশগুপ্ত বলল, হ্যাঁ, স্যার, লঞ্চ রেডি। আপনি যখন খুশি ব্যবহার করতে পারেন।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো! আমি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে চাই!

৫. তীরের কাছে সমুদ্রের জল

তীরের কাছে সমুদ্রের জল খানিকটা ফিকে নীল আর সবুজে মেশানো, একটু দূরে গেলেই গাঢ় নীল। দূরে দূরে দু-একটা ছোট-ছোট দ্বীপ দেখা যায়। একটু পরেই মোটরবোটটা গভীর সমুদ্রে পড়ল।

মোটরবোটটা ছোট, কিন্তু খুব জোরে যায়। বিরাট-বিরাট ঢেউয়ের ওপর দিয়েও অনায়াসে চলে যাচ্ছে। শঙ্করনারায়ণ নামে একজন সেই বোটটা চালাচ্ছে, তার সঙ্গে রয়েছে আরও দুজন লোক।

সন্তু ভেবেছিল, সমুদ্রের ওপর দিয়ে মোটরবোটে চেপে যেতে তার দারুণ লাগবে। তার বন্ধুদের মধ্যে কারুর তো এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি কখনও। কিন্তু খানিকটা পরেই তার আর ভাল লাগল না। কী রকম মাথা ঘুরতে লাগল, পেটের মধ্যে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, তার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। সন্তু নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। বেড়াতে এসে এরকম তো কখনও হয় না। তার।

সমুদ্র দেখতে একঘেয়ে লাগছে, একসময় সে শুয়ে পড়ল কাঠের বেঞ্চের ওপর। কাকাবাবু সামনের দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে বসে ছিলেন, একবার পিছন ফিরে সন্তুকে শুয়ে থাকতে দেখেই তিনি উঠে এলেন। কাছে এসে বললেন, কী সন্তু, শরীর খারাপ লাগছে?

সন্তু লজ্জিতভাবে বলল, না, না, এই এমনি একটু শুয়ে আছি।

তাড়াতাড়ি সে উঠে বসার চেষ্টা করল, তার ভয় হল, তার শরীর খারাপ দেখলে কাকাবাবু যদি তাকে ডাকবাংলোয় রেখে আসার কথা বলেন!

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, মাথা ঘুরছে? পেট ব্যথা করছে?

সন্তু উত্তর দেবার আগেই দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করল, ও বুঝি আগে কখনও সমুদ্রে আসেনি?

না।

তাহলে তো সী সিকনেস হবেই। এত বড় বড় ঢেউ–

দেখি, আমার কাছে বোধহয় ট্যাবলেট আছে।

কাকাবাবু তাঁর বড় চামড়ার ব্যাগ হাতড়ে দুটো ট্যাবলেট বার করলেন। ঐ ব্যাগটার মধ্যে অনেক কিছু থাকে। এমন-কী, কাঁচি, গুলিসূতো, আঠার শিশি পর্যন্ত সন্তু দেখেছে।

কাকাবাবু বললেন, এই ট্যাবলেট দুটো খেয়ে নাও সন্তু। তারপর শুয়ে থাকে। যদি বমি পায় বমি করে ফেলবে, লজ্জার কিছু নেই।

সন্তুর সত্যি একটু-একটু বমি পাচ্ছিল। কিন্তু অতি কষ্টে চেপে রইল। পেটের মধ্যেও যেন সমুদ্রের ঢেউ ওঠা-নমা করছে।

সন্তু এক সময় ঘুমিয়েই পড়েছিল, হঠাৎ দাশগুপ্তের চিৎকারে জেগে উঠল।

দাশগুপ্ত বলল, ঐ দেখুন, ঐ দেখুন!

সন্তু ধড়মড় করে উঠে বসে বলল কী? কী?

দাশগুপ্ত সমুদ্রের মাঝখানে একদিকে আঙুল তুলে বলল, ঐ যে, দেখতে পাচ্ছ?

সন্তু দেখল, একটু দূরে জলের মধ্যে একটা খয়েরী তিনকোনা জিনিস উঁচু হয়ে আছে।

কী ওটা?

হাঙর। ঐ দাখো আর একটা।

হাঙর। ঐ রকম দেখতে?

ঐটুকু তো শুধু পাখনা। বাকি হাঙরটা জলের নীচে আছে।

ক্রমে দশ-বারোটা হাঙরের পিঠের পাখনা দেখা গেল। দাশগুপ্ত সন্তুকে ভয় দেখিয়ে বলল, দেখেছ, তো? এখানে একবার জলে পড়লে আর বাঁচবার উপায় নেই। হাঙরগুলো এক মিনিটে শেষ করে দেবে।

কাকাবাবু একটা দূরবীন চোখে লাগিয়ে বসে ছিলেন। খানিকটা দূরেই একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। তিনি দাশগুপ্তকে একটু ধমক দিয়ে বললেন, হঠাৎ ওরকম ভাবে চেঁচিয়ে উঠে না। আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি কোনও মানুষজন দেখতে পেয়েছ?

দাশগুপ্ত আবার চুপ করে গেল।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই যে দ্বীপগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলোতে নামা যায়?

দাশগুপ্ত বলল, না, স্যার, জেটি না থাকলে নামবেন কী করে? বেশি কাছে গেলে বোট তো বালিতে আটকে যাবে।

একেবারে কাছে না গিয়ে যদি খানিকটা দূরে বোট দাঁড় করিয়ে জলে নেমে পড়া যায়?

দাশগুপ্ত একেবারে আঁতকে উঠল। চোখ দুটো টলগুলির মতন গোল গোল করে বলল, না, না, তা কখনও হয়? এখানে যেখানে-সেখানে জলে নামতে যাবেন না। তাহলেই হাঙর এসে একেবারে ক্যাঁচ করে পা কেটে নিয়ে যাবে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, স্যার, সত্যি কথা! একবার আমাদের চেনা একজনের পা কেটে নিয়েছিল।

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, আমার তো একটা পা এমনিতেই অকেজো হয়ে আছে। হাঙর কি মানুষের দুটো পাই কেটে নিয়ে যায়? সব সময় তো শুনি ওরা মানুষের এক পা কাটে, আর এক পা রেখে যায়।

দাশগুপ্ত মজাটা বুঝল না। সে তখনও ভয় পাওয়া গলায় বলল, ওসব চিন্তা ছাড়ুন। আপনি কি দুশোটা দ্বীপের প্রত্যেকটাতেই নেমে নেমে দেখতে চান? সে তো অসম্ভব ব্যাপার

এই দ্বীপে মানুষ থাকতে পারে?

কী করে পারবে? খাবার জল কোথায়? সমুদ্রের জল তো খাবার উপায় নেই। চারিদিকে এত জল, দেখে দেখে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল। এই সব দ্বীপে কেউ দুদিন থাকলে জল তেষ্টাতেই শুকিয়ে মরবে!

তাহলে যে-সব দ্বীপে মানুষ থাকে, সেখানে কীভাবে জল পাওয়া যায়?

সে তো ঝরনার জল! যে-সব দ্বীপে বড় পাহাড় আছে, সেখানে ঝরনাও আছে। খুব মিষ্টি জল।

কাকাবাবু শুধু বললেন, হুঁ।

মোটরবোটটা এবার মূল সমুদ্র ছেড়ে খাঁড়িতে ঢুকল। খাঁড়ি মানে, দু-পাশে দ্বীপ, তার মাঝখান দিয়ে সমুদ্রের রাস্তা। দু-পাশের দ্বীপগুলো দারুণ ঘন জঙ্গলে ভরা, এক-একটা গাছ প্রকাণ্ড লম্বা-তার গায়ে লতাপাতায় ফুটে আছে। নানারকম ফুল। এ সব জায়গায় একটা গাছও চেনা গাছের মতন নয়।

দাশগুপ্ত ফিসফিস করে সন্তুকে বলল, তাকিয়ে থাকে, একটু পরেই কুমির দেখতে পাবে।

সন্তু বলল, কুমির? জলের মধ্যে ভেসে উঠবে?

না। দেখবে পাশের বালির চড়ায় রোদ পোহাচ্ছে। লঞ্চের আওয়াজ শুনেই ঝুপঝাপ করে জলে লাফিয়ে পড়বে।

সন্তু একেবারে বুকে পড়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

দাশগুপ্ত বলল, আজ যদি ভাগ্যে থাকে, তাহলে সাদা কুমিরও দেখতে পাবে।

কাকাবাবু আবার মুখ ফেরালেন। দাশগুপ্তকে বললেন, কী বাজে কথা বকছ? সাদা কুমির আবার হয় নাকি?

হ্যাঁ, স্যার, হয়। মাঝে মাঝে দেখা যায়! একবার একটা বিরাট তিমিমাছও এসে পড়েছিল নিকোবরের দিকে। তার কঙ্কালটা রাখা আছে পোর্ট ব্লেয়ারে। আর কুমির আর হাঙরের যা লড়াই বাধে না, স্যার, সে একটা দেখার মতন জিনিস।

কাকাবাবু হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে বললেন, মানুষ! ঐ যে মানুষ দেখা যাচ্ছে!

সন্তু কুমির দেখলে যতটা উত্তেজিত হত, কাকাবাবু মানুষ দেখে তার থেকে বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। সত্যি দেখা গেল বনের মধ্যে দুটি খাঁকি প্যান্ট পরা লোক ভেতর দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

দাশগুপ্ত কিন্তু বেশি উত্তেজিত হল না। বলল, হ্যাঁ, এদিকে বন বিভাগের কিছু লোক কাঠ কাঠতে আসে। কিন্তু ওদের শুধু বাঁ দিকেই দেখতে পাবেন। ডান দিকে পাবেন না?

কেন?

এই দিকের জঙ্গলে কারুর নামা নিষেধ। এই দিকের জঙ্গলেই জারোয়ারা থাকে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, জারোয়া কী?

এই রে, এর মধ্যে ভুলে গেলে? তখন বললাম যে! জারোয়া হচ্ছে খুব হিংস্র একটা জাত। তারা জামাকাপড় পরে না, তারা বিষাক্ত তীর মারে-আমাদের মতন লোক দেখলেই তারা খুন করতে চায়।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এই যে এখান দিয়ে মোটরবোট কিংবা স্টিমার যায়-এর ওপর তারা তীর মারে না? হঠাৎ যদি তীর ছুড়তে শুরু করে?

দাশগুপ্ত বলল, সেই জন্যই দেখবেন, একটু পরে-পরে পুলিশের ক্যাম্প বসানো আছে-পুলিশ ওদের সমুদ্রের ধারে আসতে দেয় না। ওদের দেখলেই গুলির আওয়াজ করে ভয় দেখায়। ওরা বন্দুককে খুব ভয় করে।

সন্তু বলল, ওদের বন্দুক নেই বুঝি?

বন্দুক কী বলছি, ওরা আগুন জ্বালাতেই জানে না! ওরা লোহার ছুরিও ব্যবহার করতে জানে না। ওদের যে তীর, তার ডগায় লোহা নেই, এমনিই সরু বাঁশের তীর-কিন্তু সেগুলোতে সাঙ্ঘাতিক বিষ মাখানো থাকে। অনেক সময় সমুদ্রতে শিশি বোতল ভেসে-ভেসে আসে তো, সেই বোতল ভেঙে ওরা কাচের ছুরি বানায়। কিংবা ঝিনুক বা পাথরের ছুরিও আছে। তবে শুনেছি, ওরা মাঝে মাঝে এদিকে এসে লোহা চুরি করারও চেষ্টা করে। সেই লোহা ঘষে ঘষে ধারালো অস্ত্র বানাচ্ছে।

কাকাবাবু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, জারোয়ারা যেখানে থাকে, সেখানে কোনও সভ্য মানুষ ঢোকেনি এ পর্যন্ত?

কার বুকের এত পাটা আছে বলুন? ওখানে ঢুকলে কেউ প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারে না। চলুন না, একটু দূরে একটা জায়গা আপনাকে দেখাচ্ছি।

তাহলে একথা মনে করা যেতে পারে যে, যে-সব বৈজ্ঞানিক আগে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তারা এ-জায়গাতেই যাবার চেষ্টা করেছিল?

তা হতে পারে এখানে যে সাহেবদের দেখেছিলাম, তারাও তো এখানে আসবার চেষ্টা করতে পারে। কারণ তাদের কাছে নিশ্চয়ই বন্দুক-পিস্তল আছে!

সেটা কিন্তু বলা শক্ত। মাত্র দু-তিনজন সাহেব বন্দুক পিস্তল নিয়েও এখানে এসে কী করবে? পাঁচ-ছাঁশো হিংস্র জারোয়া যদি তাদের ঘিরে ধরে-

এই দ্বীপের উল্টো দিকেও তো সমুদ্র, সেখানে যাওয়া যায় না?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যায়। তবে সেদিকে পুলিশ-পাহারা নেই। জারোয়ারা একেবারে তীরের কাছে যখন-তখন চলে আসে-

আমি সেদিকে একবার যেতে চাই।

দাশগুপ্ত আবার অবাক হয়ে বলল, এখন?

কাকাবাবুজোর দিয়ে বললেন, কেন, এখন যাওয়া যায় না?

তাহলে স্যার বড দেরি হয়ে যাবে যে? আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে?

খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

তা হলেও-মানে, এই বোটের শুধু এদিক দিয়ে যাওয়ারই পুলিশ-পারমিশান আছে। অন্য দিক দিয়ে যাবার জন্য আবার আলাদা করে অনুমতি নিতে হবে। চলুন না। দেখি যদি রঙ্গত্ব থেকে সেই অনুমতি জোগাড় করা যায়। ফেরার পথে না হয়-

দাশগুপ্ত আর একটু থেমে কাচুমাচুভাবে বলল, একটা কথা স্যার, ঐ জারোয়াদের মধ্যে যাবেন না! আপনি যে রহস্যের কথা বলছিলেন, তা কি শুধু ঐ জায়গাতেই আছে? তাহলে সে রহস্য যেমন আছে, থাক না! কেন শুধু শুধু প্রাণটা দিতে যাবেন।

কাকাবাবু বললেন, সব মানুষ তো এক রকম হয় না? কেউ কেউ ভাবে, সব যেমন চলছে তেমন চলুক। পুরনো জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করার কী দরকার? আর কোনও-কোনও লোক একটা জিনিস একবার ধরলে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না। এই রহস্যটা যদি আমি বুঝতে না পারি, তাহলে কোনওদিন আমার রাত্তিরে ঘুম হবে না।

কিন্তু স্যার, ওখানে গেলে যে আমাদের প্রাণটাও যাবে।

তোমাদের কারুর যাবার দরকার নেই।

তা কখনও হয়? গভর্নমেন্ট থেকে আমার ওপর হুকুম হয়েছে, সব সময় আপনার সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে। আপনাকে সব রকম সাহায্য করতে।

তাহলে গভর্নমেণ্ট তো তোমাকে খুব বিপদে ফেলেছে দেখছি?

না স্যার, আমি তো আপনাকে সাহায্য করতেই চাই। আপনি তো এদিককার ব্যাপার সব জানেন না।

আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

ঐ যে বললাম, রঙ্গত্। এদিককার বেশ বড় জায়গা। আমি ওয়ারলেসে আমাদের আসবার কথা জানিয়ে দিয়েছি। জেটিতে জিপগাড়ি রাখা থাকবে। ওখানে খুব সুন্দর ডাকবাংলো আছে, পাহাড়ের ওপরে–

সেখানে পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে?

তিনটের মধ্যে পৌঁছে যাব। রঙ্গত্ থেকে আরও অনেক জায়গায় যাওয়া যায়। আপনি যদি চান, আমরা মায়াবন্দরের দিকেও যেতে পারি। আমরা কী মনে হয় জানেন? ঐ সাহেবগুলো মায়াবন্দরে থাকতে পারে!

কেন?

মায়াবন্দর খুব সুন্দর জায়গা। সাহেব-মেমরা খুব পছন্দ করে।

সে তো যারা বেড়াতে আসে! এই সাহেবরা এখানে বেড়াতে এসেছে, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। তাহলে তারা এত লুকোচুরি করত না।

একটুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। মোটরবোটের গুটিগুটি শব্দ শুধু শোনা যায়। খাঁড়ির সমুদ্রে ঢেউ বেশি নেই। দুপাশেই দেয়ালের মতন জঙ্গল।

সন্তু কুমির দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। এক সময় সত্যিই দেখা পেল। দুটো কুমির বালির ওপর শুয়ে ছিল। ঠিক যেন দুটো পোড়া কাঠ। বোটের শব্দ শুনে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। তারপর খুব একটা ভয় না-পেয়ে আস্তে আস্তে জলে নামল।

সন্তু বলল, ঐ যে! ঐ যে কুমির!

দাশগুপ্ত একটু অবহেলার সঙ্গে বলল, এ দুটো তেমন বড় নয়! আরও বড় আছে। এইটাই কিন্তু সেই জায়গা

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কোন জায়গা?

সেই যে বলেছিলাম দেখাব! এ জায়গাটার বালির রঙ দেখছি কেমন সোনালী সোনালী? অরুণ্যদেবের গল্পে সোনা-বেলার কথা পড়েছ তো?

এই সেই সোনা-বেলা নাকি? তাহলে সেই জেড পাথরের ঘর কোথায়?

না, এটা সোনা-বেলা নয়। তবে এখানকার বালি খুব মিহি আর সোনালী রঙের। অনেকের ধারণা ওখানে বালির মধ্যে সোনা মিশে আছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি সোনা আছে?

না, না। গভর্নমেণ্ট থেকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, সে রকম কিছু নেই। তবু লোকের লোভ হয়। ওদিকে তো যাওয়া নিষেধ-তাও একদিন রাত্তির বেলা তিনজন লোক ওদিকে বালি নেবার জন্য নেমেছিল। তিনটে বস্তায় বালি ভরেছে, এমন সময় পেছন থেকে জারোয়ারা আক্রমণ করে! দুটো ছেলেকে তক্ষুনি মেরে ফেলে–আর একটি ছেলে একজন জারোয়ার পেটে ছুরি মেরে নিজেকে কোনও রকমে ছাড়িয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জারোয়ারা সাঁতার জানে না-তাই জলে নামে না। সেই ছেলেটিও আহত হয়েছিল, সেই অবস্থায় সমুদ্রে ভাসতে থাকে। তার ভাগ্য ভাল, তাকে হাঙরে কুমিরে ধরেনি-বারো ঘণ্টা বাদে ছেলেটিকে একটা পুলিশের বোট উদ্ধার করে। তারপর তার পাগলের মতন অবস্থা। তারপর থেকে সে অনবরত চেঁচিয়ে বলে, জারোয়া! ঐ যে জারোয়া।

গল্প বলার সময় ঝোঁকের মাথায় দাঁড়িয়ে উঠে নিজেই সেই ছেলেটিকে নকল করে বলতে থাকে, জারোয়া! ঐ যে জারোয়া!

সন্তু হাঁ করে ঘটনাটা শুনছিল। কিন্তু কাকাবাবু হঠাৎ দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সেই ছেলেটিকে কখনও দেখেছি? নিজের চোখে?

দাশগুপ্ত থতমত খেয়ে বলল, তা দেখিনি। তবে সবাই এটা জানে!

কাকাবাবু বললেন, গল্প! এসব বানানো গল্প!

না স্যার, আপনি রঙ্গতে গিয়ে যাকে খুশি জিজ্ঞেস করবেন।

আমি লক্ষ করেছি তুমি বড় গল্প বানাও।

দাশগুপ্ত এর পর একেবারেই চুপ করে গেল।

তিনটের সময় বোট এসে ভিড়ল। রঙ্গতে। জেটি থেকে উঠে এসে বাইরের রাস্তায় দেখা গেল সত্যি একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আরও আট-ন মাইল যেতে হবে।

সন্তু গিয়ে জিপে উঠে বসেছে। কাকাবাবুজিপে উঠতে গিয়েও থেমে গিয়ে বললেন, আমার চশমাটা বোটে ফেলে এসেছি।

দাশগুপ্ত বলল, আমি নিয়ে আসছি।

না, আমিই আনছি।

কাকাবাবু ক্রাচ খট-খাট করে নিজেই এগিয়ে গেলেন জেটির দিকে।

তারপর একটু বাদে মোটরবোটটার ইঞ্জিনের ঘট্‌ঘট্‌ আওয়াজ শোনা গেল।

দাশগুপ্ত চেঁচিয়ে উঠল, আরো বোটটা ছেড়ে গেল যে! কাকাবাবু গেলেন কোথায়?

সন্তু তাড়াতাড়ি ছুটে এল জেটির কাছে। মোটরবোটটা সাঁ করে জল কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দাশগুপ্ত তার পাশে এসে বলল, সর্বনাশের ব্যাপার! মোটরবোটটা আপনা-আপনি চলতে লাগল নাকি? তাহলে কি হবে? শঙ্করনারায়ণ, শঙ্করনারায়ণ?

বোটের চালক শঙ্করনারায়ণও বোটটার দিকে তাকিয়ে দেখছে। লোকটি খুব কম কথা বলে। এবার সে বলল, বোট কখনও আপনা- আপনি চলে। ওটা তো। উনি চালাচ্ছেন।

দাশগুপ্তর চোখ ট্যারা আর মুখ হাঁ হয়ে গেছে। সে ভয়-পাওয়া গলায় নললে, উনি নিজে বোট চালাচ্ছেন? তাহলে উনি নিশ্চয় একলা-একলা জাগোয়াদের কাছে যেতে চান। উঃ, কী গোঁয়ার লোক রে বাবা! জারোয়ারা □কে মেরে ফেলবেই। আমি গভর্নমেন্টকে কী জনাব?

মোটরবোটটা এখনও দেখা যাচ্ছে। সন্তু চিৎকার করে ডেকে উঠল, কাকাবাবু! কাকাবাবু!

দাশগুপ্তও চ্যাঁচাল, মিঃ রায়চৌধুরী।

শঙ্করনারায়ণ গম্ভীরভাবে বলল, উনি বেশি দূর যেতে পারবেন না। বোটে ডিজেল নেই। আমি এখান থেকে ডিজেল নেব ঠিক করেছিলাম।

দাশগুপ্ত বলল, অ্যাঁ? ডিজেল নেই? থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ শঙ্করনারায়ণ! তবে তো উনি আর জারোয়াদের জঙ্গলে যেতে পারবেন না?

মোটরবোটটা কিন্তু ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সন্তু ভাবল, মোটরবোটটার ডিজেল যদি ফুরিয়ে যায়, তাহলে কাকাবাবু মোঝ-সমুদ্রে এক-একা ভাসবেন? বোটে তো খাবার-দাবার কিছু নেই!

দাশগুপ্ত বলল, উঃ, কী ডানপিটে লোক বাবা! তাও তো একটা পা অচল। দুটো পা থাকলে আরও কী করতেন কে জানে। আচ্ছা, সন্তু, ওঁর একটা পা কাটল কী করে?

আফগানিস্তানে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।

ওরে বাবা, উনি আফগানিস্তানেও গিয়েছিলেন?

শঙ্করনারায়ণ জেটির সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গিয়ে বালির চড়া ধরে দৌড়তে লাগল। দুরে এক জায়গায় কয়েকটা মোটরবোট রয়েছে। ওর মধ্যে কোনওটা মাছ ধরার, কোনওটা মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার। একটু বাদেই শঙ্করনারায়ণ একটা বোট চালিয়ে নিয়ে এল জেটির পাশে। তারপর বলল, আপনারা একজন কেউ আসুন।

দাশগুপ্ত বলল, আমি যাচ্ছি। তুমি একটু থাকো, সন্তু।

সন্তু সে কথা শুনল না। সে লাফিয়ে গিয়ে মোটরবোটে উঠল।

শঙ্করনারায়ণ এত জোরে বোটটা চালিয়ে দিল যে, ওরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল আর-একটু হলে। সবাই শক্ত করে ধরে রাখল রেলিং।

একটু বাদেই আগের মোটরবোটটা দেখা গেল। সেটা এদিক-ওদিক এঁকে-বেঁকে যাচ্ছে। কাকাবাবু ভাল চালাতে পারছেন না। দাশগুপ্ত এদিক থেকে আবার চ্যাঁচাতে লাগল, মিঃ রায়চৌধুরী, মিঃ রায়চৌধুরী!

খানিকক্ষণ দুই বোটে পাল্লা চলল। কাকাবাবু থামতে চান না। তারপর হঠাৎ এক সময় কাকাবাবুর বোটটা থেমে গেল। মোটরবোট যখন সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলে, তখন তার একটা বেশ তেজী ভাব থাকে। থেমে গেলেই কী রকম যেন অসহায় দেখায়। ঠিক যেন একটা মোচার খোলা।

শঙ্করনারায়ণ প্রথমে এই বোটটা নিয়ে কাকাবাবুর বোটের চারপাশে বোঁ বো করে ঘুরুল কয়েকবার। তারপর একবার কাছাকাছি এসে একটা দড়ি নিয়ে ঐ বোটে লাফিয়ে পড়ল।

পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েও কাকাবাবুর কিন্তু লজ্জা নেই। বরং মুখে একটা রাগ-রাগ ভাব। কেউ কিছু বলার আগেই তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, এই বোটটা হঠাৎ আপনা-আপনি থেমে গেল কেন?

শঙ্করনারায়ণ বলল, তেল নেই আর!

কাকাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, কেন, তেল থাকে না কেন?

দাশগুপ্ত বলল, স্যার, আপনি এটা কী করছিলেন? এ-রকম পাগলামি করার কোনও মানে হয়? ওদিকে রঙ্গতে সবাই আমাদের জন্য খাবার-দাবার নিয়ে বসে আছে।

কাকাবাবু বললেন, আমি এখানে খেতে আসিনি। একটা কাজ করতে এসেছি।

কিন্তু কাজ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! কাজ মানে তো ঐ সাহেবগুলোকে খোঁজা? ওরা আর যাবে কোথায়?

আমি একটুও সময় নষ্ট করতে চাই না।

কিন্তু স্যার, আপনাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। আপনি ঐ জারোয়া-ল্যাণ্ডে যেতে পারবেন না। অর্ডার ছাড়া আমি কিছুতেই আপনাকে ওখানে যেতে দিতে পারি না।

অর্ডারটা দেবে কে?

পুলিশের এস পি সাহেবের কাছ থেকে অর্ডার আনতে হবে। তাও তিনি পারমিশান দেবেন কিনা সন্দেহ। কয়েকজন সাহেব ছবি তোলবার জন্য এসেছিল, তাও দেওয়া হয়নি।

কাকাবাবু আর কোনও কথা না-বলে এই বোটে উঠে এলেন। ঐ বোটটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল, তারপর দুটোই চলল একসঙ্গে।

তারপর জেটিতে পৌঁছে ওরা বোট থেকে নেমে জিপে উঠলেন, বেশ চওড়া বাঁধানো রাস্তা, দুপাশে বড় বড় গাছ, কিন্তু মানুষজন বা বাড়িঘর বিশেষ দেখাই যায় না। এটাও একটা দ্বীপের মধ্যে, কিন্তু দু পাশের ঘন জঙ্গল দেখে সে-কথা আর মনে থাকে না।

৬. রঙ্গতে পৌঁছনো গেল

আধা ঘণ্টার মধ্যেই রঙ্গতে পৌঁছনো গেল। দাশগুপ্ত বলেছিল, রঙ্গত বেশ জড় জায়গা। আসলে একটা ছোট গ্রামের চেয়েও ছোট। কয়েকটা দোকান, দু-তিনটে হোটেল আর কিছু বাড়িঘর। যে-কোনও বাড়ির পেছনেই নিবিড় বন।

রঙ্গতের ডাকবাংলো একটা উঁচু পাহাড়ের ওপরে। রাস্তাটা এমন খাড়া যে, জিপটা ওঠবার সময় রীতিমতন গোঁগোঁ শব্দ করছে। যে-দিকে তাকানো যায়, শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল।

বাংলোটা অবশ্য বেশ সুন্দর। দোতলা বাড়ি, বড় বড় কাচের জানলা, সামনে সুন্দর ছোট্ট একটা ফুলের বাগান। দোতলার জানলার সামনে দাঁড়ালে বহু দূর পর্যন্ত পাহাড় আর বন দেখা যায়-এখান থেকে আর সমুদ্র দেখা যায় না। এখানকার জঙ্গল এত ঘন যে আফ্রিকার কথা মনে পড়ে যায়-গল্পের বইতে যে-রকম জঙ্গলের কথা আমরা পড়েছি।

রান্না তৈরিই ছিল। ভাত, বড় বড় চিংড়ি মাছ ভাজা আর হরিণের মাংস। বাংলোর চৌকিদার খুব দুঃখ করে বলল, সে কিছুতেই পাঠার মাংস জোগাড় করতে পারেনি, তাই বাধ্য হয়ে হরিণের মাংস রোধেছে। সন্তু তো অবাক! পাঠার মাংস তো সে কতই খেয়েছে-কিন্তু হরিণের মাংস খাওয়াই দরুণ ব্যাপার। এখানে হরিণের মাংস খুবই শস্তা, এমন-কী, এক-একদিন বিনা পয়সাতেও পাওয়া যায়। মাছ তো শস্তাই। এখানে সবচেয়ে দামি জিনিস তরকারি। অনেক লোক তিন-চার বছরের মধ্যে ফুলকপি চোখেই দেখেননি।

কাকাবাবু দারুণ গম্ভীর, কারুর সঙ্গে কোনও কথা বলছেন না। সন্তু কাকাবাবুর এই স্বভাবটা জানে। অনেক লোক শুধু নিজের বাড়ির লোকজন কিংবা টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করেন। কিন্তু কাকাবাবু এমন সব জিনিস নিয়ে চিন্তা করেন, যার সঙ্গে তাঁর নিজের কোনও সম্পর্কই নেই। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বৈজ্ঞানিকরা এসে আন্দামানে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে, এজন্য কাকাবাবুর রাত্তিরে ঘুম হবে না কেন? কত লোক তো তবুও ঘুমোয়!

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সন্তু শুনতে পেল, কাকাবাবু এক-একা বারান্দায় পায়চারি করছেন। বরান্দাটা কাঠের। সেখানে কাকাবাবুর ক্রাচের শব্দ হচ্ছে ঠক্ ঠক্ ঠক্।

সকালবেলা দাশগুপ্ত বলল, স্যার, জিপ রেডি! কখন বেরুবেন?

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাব?

যেখানে আপনার খুশি। এখানে কত বেড়াবার জায়গা আছে! চিত্রকূট যাবেন?

আমি এখানে বেড়াতে আসিনি, দাশগুপ্ত!

চিত্রকূট নামটা শুনে সন্তুর খুব কৌতূহল হল। চিত্রকূট নামটা তো রামায়ণ বইতে আছে। এখানেও একটা চিত্রকূট আছে নাকি? জায়গাটা কেমন?

দাশগুপ্ত এক গাল হেসে বলল, স্যার, কাজ তো আছেই! তবু এত দূর এসে একটু বেড়াবেন না? এখানে ভাল-ভাল জায়গা আছে। মায়াবন্দর যাবেন? চমৎকার জায়গা! আর যদি ডিগলিপুর যেতে চান, তাও ব্যবস্থা করা যায়। হরিণের পাল আর কুমির দেখতে হলে ডিগলিপুর যেতে হয়! যাবেন? সন্তুর কাছে মায়াবন্দর নামটাও খুব সুন্দর লাগল। সত্যিই এ-রকম নামের কোনও জায়গা আছে? জায়গাটা কি যখন-তখন বদলে যায়?

কাকাবাবু কড়া সুরে বললেন, আমি কোথাও যেতে চাই না। আমি আজই ফিরে যেতে চাই।

দাশগুপ্ত হতাশভাবে বলল, আজই ফিরে যাবেন? একটা দিন থেকে গেলে হয় না?

না! শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। এখানে আমাকে এনেছ কেন? আমি কি জায়গা দেখতে এসেছি? আজই ফিরে গিয়ে এসপি-র সঙ্গে দেখা করে অনুমতি নিয়ে নাও, যাতে আমি যে-কোনও জায়গায় যেতে পারি। এস পি যদি অনুমতি না দেন, তাহলে আমাকে দিল্লিতে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে?

দাশগুপ্তর নিজেরই আসলে খুব বেড়াবার ইচ্ছে। বোঝা যায়, লোকটি আসলে খুব বেড়াতে ভালবাসে। তার মুখ দেখলে আরও বোঝা যায়, কাকাবাবুর কথা তার একটুও পছন্দ হয়নি। কাকাবাবুর দিল্লিতে টেলিগ্রাম পাঠাবার কথা শুনে সে আরও ভয় পেয়েছে।

সকালবেলায় চা-জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়া হল। আবার জিপে করে সেই বন্দর পর্যন্ত যাওয়া। কাকাবাবু আগাগোড়া মুখ বুজে রইলেন। জেটিতে গিয়ে মোটরবোটে ওঠার সময় শুধু বোট-চালককে একবার প্রশ্ন করলেন, ভাল করে তেল ভরে নেওয়া হয়েছে তো? আবার কোথাও এটা থেমে যাবে না?

এই প্রথম শঙ্করনারায়ণকে হাসতে দেখল। সন্তু। সে বলল, না, স্যার, থামবে না। আশা করছি, ঘণ্টা চারেকের মধ্যে পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছে যাব।

ঠিক আছে, চলো।

আশ্চর্যের ব্যাপার, মোটরবোটটা ছাড়বার পরই কাকাবাবু চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লেন। আসবার সময় তিনি চারদিক দেখতে-দেখতে আসছিলেন, কিন্তু এখন আর তাঁর কোনও আগ্রহই নেই।

সন্তু কিন্তু খুব আগ্রহের সঙ্গে চোখ মেলে রইল। এবার আর তার পেট ব্যথা হচ্ছে না কিংবা বমিও পাচ্ছে না। আসবার সময় সে শুধু ডান দিকটা দেখেছিল, এবার বসল। বাঁদিকে। যদি আবার কুমির কিংবা হাঙর দেখা যায়।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ওরা সেই জায়গাটায় এসে গেল, যেখানে জারোয়ারা থাকে। সেই বালির চড়াটাও দেখা গেল, যেটার নাম দাশগুপ্ত বলেছিল সোনা-বেলা। এখানকার বালিতে নাকি সোনা মিশে আছে।

ভুল হচ্ছে কিনা মিলিয়ে দেখবার জন্য সন্তু দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করল, এইটা সেই জায়গা নয়? যেখানে কয়েকটা ছেলে নেমেছিল, আর জারোয়ারা হঠাৎ এসে আক্রমণ করল?

দাশগুপ্ত বলল, হ্যাঁ, ঠিক চিনেছ!

তারপর দাশগুপ্ত ফিসফিস করে বলল, তোমাকে তখন আমি ঘটনাটা ধললাম, আর তোমার কাকাবাবু বিশ্বাস করলেন না। উনি ভাবলেন আমি বানিয়ে বলেছি! আমি কিন্তু ঠিকই বলেছিলাম। জারোয়ারা এমন হিংস্র-

কাকাবাবু এই সময় চোখ মেলে বললেন, আমি এখনও তোমার কথা বিশ্বাস করি না?

তার মানে কাকাবাবু সব শুনছিলেন? সজাগই ছিলেন উনি!

কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হুকুমের সুরে বললেন, বোট ঘোরাও! আমি ওই বালির চরে নামব!

দাশগুপ্ত বলল, সে কী? অসম্ভব! আপনাকে কিছুতেই নামতে দেব না, স্যার! আপনাকে বললাম না, অর্ডার ছাড়া এখানে নামা যায় না। আপনি কি প্রাণটা খোয়াতে চান?

কাকাবাবু হঠাৎ এবার কোটের পকেট থেকে তাঁর রিভলভারটা বার করলেন। তারপর সেটা উঁচু করে তুলে বললেন, আমি যা বলছি, তাই শুনতে হবে! বোট ঘোরাও!

কাকাবাবু খটু খটু করে এসে শঙ্করনারায়ণের ঘাড়ের কাছে রিভলভারটা চেপে ধরে বললেন, শঙ্করনারায়ণ, তুমি খুব ভাল ছেলে, আমার কথা শুনে চলো! নইলে, তোমাকে আহত করে আমি নিজেই বোট ঘোরাব।

শঙ্করনারায়ণ একটাও কথা উচ্চারণ না করে খাঁড়ির ডান দিকে মোটরবোট ঘোরাল।

সেটা বালির চরে এসে থামবার পর কাকাবাবু নিজের ক্রচ নিয়ে অতি কষ্টে নামলেন। হাতব্যাগটাও নিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, তোমরা সবাই ফিরে যাও! আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না।

দাশগুপ্ত হাত জোড় করে কাদো-কাঁদো গলায় বলল, স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনি কেন এখানে যাচ্ছেন? আপনার রহস্য সমাধান করার জন্য এ ছাড়া আর কোনও জায়গা কি নেই?

কাকাবাবু বললেন, তার কারণ, অন্য সব জায়গায় গভর্নমেন্টের লোকেরা কখনও-না-কখনও যায়। সেখানে অদ্ভুত কিছু থাকলে এতদিনে জানা যেত! শুধু এই জায়গাটাতেই আর কেউ আসে না। সুতরাং কিছু রহস্য থাকলে এখানেই আছে। তোমরা ফিরে যাও। এস পি-কে বলে কালকে কিছু লোকজন নিয়ে আবার ফিরে এসো আমার জন্য।

তিনি এবার সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, সন্তু, তুমিও যাও, পোর্ট ব্লেয়ারে আমার জন্য অপেক্ষা করো।

দাশগুপ্ত বলল, ওরে বাবা, যে-কোনও মুহূর্তে জারোয়ারা তীর মারতে পারে।

কাকাবাবু রিভলভারটা উঁচু করে বললেন, তোমাদের আর তো থাকবার দরকার নেই। তোমরা যাও

সঙ্গে-সঙ্গে মোটরবোটটা চলতে শুরু করল।

কিন্তু সন্তু কিছুতেই কাকাবাবুকে ছেড়ে যাবে না। সে মোটরবোট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

বোটের চালক শঙ্করনারায়ণ আর একটুও দেরি করল না। সে বোটটা চালিয়ে দিল গভীর সমুদ্রের দিকে।

দাশগুপ্ত পাগলের মতন লাফাতে লাগল। সে হাত-পা ছুড়তে লাগল। এ কি? এ কি? আমরা ওদের ফেলে চলে যাব নাকি? আমার তাহলে চাকরি যাবে! পাইলট, কোথায় চলে যাচ্ছ?

শঙ্করনারায়ণ গম্ভীরভাবে বলল, বসে পড়ুন! বসে পড়ুন! গায়ে তীর লগতে পারে!

অ্যা?

দাশগুপ্ত ধপাস করে বোটের মধ্যে শুয়ে পড়ল। শঙ্করনারায়ণ বলল, সবাই মিলে একসঙ্গে মরে যাওয়ার কোনও মানে আছে? আমরা ওখানে আর একটুক্ষণ থাকলেই জারোয়ারা তীর মারত!

কিন্তু ওদের কী হবে?

মিঃ রায়চৌধুরীর কাছে রিভলভার আছে। তিনি গুলি ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে জারোয়াদের আটকাবার চেষ্টা করতে পারেন। পারবেন। কিনা জানি না! আমাদের উচিত পুলিশের এস পি সাহেবকে সব কিছু জানানো। তারপর পুলিশ নিয়ে এসে যদি ওঁদের বাঁচানো যায়-

মোটরবোটটা অনেক দূর চলে এসেছে। এখন দ্বীপের সেই জায়গাটা দেখা যায় না। শুধু দেখা যায় জঙ্গল। ওর মধ্যে বিষাক্ত তীর নিয়ে লুকিয়ে আছে জারোয়ারা। ওখানে বাইরের লোক যে একবার গেছে সে আর ফেরেনি।

দাশগুপ্ত ফোঁস ফোঁস করে দুটো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর তার এমনই দুঃখ হল যে, চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

৭. পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছতে-পৌঁছতে

পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছতে-পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। এস পি সাহেব অফিসে নেই। দাশগুপ্ত তক্ষুনি ছুটিল তাঁর বাড়িতে। সেখানে গিয়েও এক দারুণ খারাপ খবর শুনল। এস পি সাহেব এইমাত্র লিটল আন্দামান রওনা হয়ে গেছেন।

দাশগুপ্ত হতাশ হয়ে মাটিতে বসে পড়ছিল, কিন্তু এস পি সাহেবের আদলি বলল, সাহেব এই মাত্র বেরিয়েছেন, এখনও বোধহয় জেটিতে গেলে তাঁকে ধরতে পারবেন।

দাশগুপ্ত আবার দৌড়ল জেটির দিকে। দূর থেকে দেখল, এসপি-র নিজস্ব মোটরবোট তখনও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে ছাড়বে। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সে চ্যাঁচাতে লাগল, দাঁড়াও, দাঁড়াও! পাইলট, বোট ছেড়ে না?

কোনও রকমে জেটিতে এসে সে লাফিয়ে মোটরবোটের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

এস পি সাহেবের মোটরবোটটা শুধু তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য। ভেতরে তাঁর বসবার জায়গাটা সিংহাসনের মতন, লাল ভেলভেট দিয়ে মোড়া। এস পি সাহেবের চেহারাটাও দারুণ। টকটকে ফস রঙ, বিশাল মোটা গোঁফ মিশে গেছে। তাঁর লম্বা জুলফির সঙ্গে। অনেকটা হরতনের গোলামের মতন মুখ। কোমরে চওড়া বেল্টে গোঁজা রিভলভার, পায়ে কালো জুতো চকচক করছে। তিনি পা ছড়িয়ে বসে চোখ বুজে ছিলেন।

দাশগুপ্ত ধড়াম করে লাফিয়ে পড়তেই তিনি চোখ মেলে। কটমট করে তাকালেন। হুংকার দিয়ে বললেন, এখানে লাফালাফি করছ, কেন? সাকসি দেখাতে এসেছ?

দাশগুপ্ত বলল, স্যার, সর্বনাশ হয়ে গেছে!

কিসের সর্বনাশ? তোমার তো রোজই একটা করে সর্বনাশ হয়।

না, স্যার! সেই যে মিঃ রায়চৌধুরী, যিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের চিঠি নিয়ে এসেছিলেন, তিনি জারোয়াদের জঙ্গলে নেমে গেছেন?

কী?

এস পি সাহেব এবার সোজা হয়ে বসলেন। এমনভাবে দাশগুপ্তর দিকে তাকালেন যেন ওকে একেবারে পুড়িয়ে ছাই করে দেবেন।

তুমি সঙ্গে ছিলে, তাও উনি নেমে গেলেন কী করে?

দাশগুপ্ত হাত জোড় করে বলল, স্যার, আমার দোষ নেই, আমি অনেক বারণ করেছিলুম, উনি কিছুতেই শুনলেন না। জোর করে নেমে গেলেন।

কতক্ষণ আগে?

প্রায় তিন ঘণ্টা আগে।

তাহলে দেখো গিয়ে, এতক্ষণে তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসছে। লোকটা কি পাগল না রাম-বোকা? লোকটা তো রোগা আর এক পা খোঁড়া, ওকে জোর করে আটকে রাখতে পারলে না?

স্যার, ওঁর কাছে রিভলভার আছে।

এস পি সাহেব। আবার আঁতকে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, রিভলভার? কে দিয়েছে? কার হুকুমে রিভলভার নিয়ে গেছে?

জানি না। আগেই ওঁর কাছে ছিল।

ছি ছি ছি ছি! এখন যদি একটাও জারোয়াকে গুলি করে মারে, তা হলে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে! জারোয়াদের মারা বারণ, তা জানো না?

তা তো জানি। কিন্তু উনি যে কথা শুনলেন না।

বাঘ-সিংহই শিকার করা বন্ধ হয়ে গেছে। আর উনি কি মানুষ-শিকারে গেছেন? ইচ্ছেমতন জারোয়াদের গুলি করে মারবেন?

উনি গেছেন সেই রহস্যের সন্ধানে।

চুলোয় যাক রহস্য! জারোয়ারা আপনমনে নিজেদের দ্বীপে আছে, কে ওনাকে বলেছে, সেখানে গিয়ে তাদের বিরক্ত করতে? রিভলভার থাকলেও উনি বেশিক্ষণ বাঁচতে পারবেন না। নিজে তো মরবেনই, আমাদেরও চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।

এখন কী উপায় হবে, স্যার?

যাও, শিগগির প্রীতম সিংকে খবর দাও!

মোটরবোটটা ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছিল। এস পি সাহেবের হুকুমে সেটা এসে আবার জেটিতে ভিড়ল। একজন গার্ড ছুটে গেল প্রীতম সিংকে ডেকে আনার জন্য।

প্রীতম সিং ছিলেন পুলিশের একজন ইন্সপেকটর। এখন রিটায়ার করে পোর্ট ব্লেয়ারেই বাড়ি বানিয়ে আছেন। একমাত্র এই প্রীতম সিং-ই কয়েকবার জারোয়াদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি জারোয়াদের ভাষাও জানেন। জারোয়ারা অন্য সবাইকে দেখলেই মারতে আসে, শুধু প্রীতম সিংকে কিছু বলে না।

আন্দামানে আদিবাসীদের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে বলে গভর্নমেন্ট নানাভাবে সাহায্য করে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান। পুলিশের লোক গিয়ে মাঝে-মাঝে ওদের দ্বীপে নানারকম খাবার রেখে আসে। ভাত, চিনি, গুঁড়ো দুধ, নানারকমের ফল। পুলিশেরা চলে যাবার খানিকক্ষণ পর জারোয়ারা এসে সেইসব নিয়ে যায়। তাদের জামা-কাপড় পরাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু জামা-কাপড় রেখে এলে তারা নেয় না, শুধু তারা পছন্দ করে লাল কাপড়। লাল কাপড় নিয়ে তারা কী করে কে জানে! জারোয়াদের কিন্তু খুব আত্মসম্মান-জ্ঞান

আছে। তারা ঐ সব জিনিস এমনি-এমনি নেয় না। অবশ্য ঐ সব খাবার-দাবার আর লাল কাপড়ের বদলে টাকা-পয়সা তারা দিতে পারে না, কিন্তু অনেকখানি শুয়োর আর হরিণের মাংস ঐ জায়গায় রেখে যায় পুলিশদের জন্য।

প্রীতম সিং-এর দারুণ সাহস। একবার তিনি এক ঐ খাবারের বস্তার মধ্যে লুকিয়ে বসে ছিলেন একদম ন্যাংটো হয়ে। জারোয়ারা কাছে আসতেই তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে হাত উঁচু করে দাঁড়ালেন। তার মানে তিনি আগেই দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁর কাছে বন্দুক পিস্তল নেই, আর জারোয়াদের যেমন গায়ে পোশাক নেই, তেমনি তিনিও কোনও জামা-কাপড় পরেননি। জারোয়ারা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। তাঁকে মারেনি।

তারপর থেকে আস্তে-আস্তে তাঁর সঙ্গে জারোয়াদের ভাব হয়ে যায়। তিনি নিজেই কয়েকবার খাবার নিয়ে গেছেন। এর পরে তিনি জামা-কাপড় পরে গেলেও জারোয়ারা তাঁকে অবিশ্বাস করেনি। এখন অবশ্য তিনি বুড়ো। এখন আর পুলিশের কেউ জারোয়াদের কাছে যেতে সাহস করে না। প্রীতম সিং এই কিছুদিন আগেও জারোয়াদের কাছে একবার গিয়েছিলেন। রঘুবীর সিং নামে একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার যখন এখানে ছবি তুলতে আসেন, তখন প্রীতম সিং-ই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন জারোয়াদের দ্বীপে। প্রীতম সিং সঙ্গে ছিলেন বলেই জারোয়ারা সেই ফটোগ্রাফারকে মারেনি।

একটু বাদেই প্রীতম সিং সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দাড়ি, গোঁফ, চুল সব সাদা। কিন্তু এখনও খাঁকি প্যান্ট সার্ট পরতে ভালবাসেন। সব ঘটনা শুনে তিনি মাথা নেড়ে বললেন, খুবই চিন্তার কথা। ঐ সাহেবকে বাঁচানো খুবই শক্ত। যদি না এতক্ষণে মরে গিয়ে থাকেন?

দাশগুপ্ত বলল, ওঁর কাছে তো রিভলভার আছে। চট্ করে মারতে পারবে না।

প্রীতম সিং বললেন, আপনি জানেন না। জারোয়ারা একদম মরতে ভয় পায় না। একজনকে মারলে আমনি আর একজন এগিয়ে আসে। ওরা যদি চারদিক থেকে তীর-ধনুক নিয়ে এগিয়ে আসে, তাহলে উনি একা রিভলভার দিয়েই বা কী করবেন?

দাশগুপ্ত বলল, তবু এক্ষুনি আমাদের যাওয়া দরকার। একবার চেষ্টা করা উচিত অন্তত।

প্রীতম সিং বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হবেন না। বাঙালি ভদ্রলোক যদি এখনও সমুদ্রের ধারে লুকিয়ে থাকতে পারেন, তাহলে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে আর উপায় নেই। জারোয়াদের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল বটে, কিন্তু খাতির হয়নি। ওরা খুব কম কথা বলে। ওদের ভাষাতেই মোট তিরিশ-চল্লিশটার বেশি শব্দ নেই। ওরা আমাকে মাটিতে দাগ কেটে দেখিয়ে বলেছিল, আমি যেন তার ওপাশে কক্ষনো না। যাই! বনের ভেতরে আমাকে কোনওদিন যেতে দেয়নি। আমার মনে হয়, ওদের মধ্যে একজন এমন-কেউ আছে, যার খুব বুদ্ধি, তার কথাই ওরা মেনে চলে। একটা কিছু জিজ্ঞেস করলে ওরা সেদিন তার উত্তর না দিয়ে পরের বার দিত। আমি অনুরোধ করেছিলাম, একবার ওদের সারা দ্বীপটা ঘুরে দেখার জন্য। ঐ দ্বীপের ভেতরে তো সভ্য মানুষ কেউ যায়নি, ওখানে কী আছে, কেউ জানে না। কিন্তু পরের দিন এসে বলেছিল, না, যাওয়া চলবে না। সেদিনই মাটিতে দাগ কেটে সীমা টেনে দেয়।

দাশগুপ্ত বলল, আমার সঙ্গে পুলিশ নিয়ে যাব। আপনি শুধু ওদের বুঝিয়ে বলবেন যে, আমরা ওদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আসিনি।

আমার সে-কথা। ওরা শুনবে না! এ রকম চেষ্টা কি আগে হয়নি? অনেকবার হয়েছে। কোনও লাভ হয়নি। একবার কী হয়েছিল শুনবেন?

প্রীতম সিং এস পি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, স্যার, আপনি তখন এখানে আসেননি। সে-সময় এস পি ছিলেন মিঃ ভার্মা। তাঁর কথামতন পুলিশরা ফাঁদ পেতে তিনজন জারোয়াকে ধরে ফেলে। জ্যান্ত অবস্থায়। তারপর তাদের হাত পা শিকলে বেঁধে নিয়ে আসা হল। পোর্ট ব্লেয়ারে এনে তাদের শিকল খুলে দিয়ে খুব আদর-যত্ন করা হল। খাওয়ানো হল ভাল-ভাল খাবার। হেলিকপটারে চাপিয়ে তাদের দ্বীপ আর অন্যসব দ্বীপ দেখিয়ে আনা হল। অথাৎ তাদের বোঝানো হল যে, আমরা তাদের শত্রু নই, আমরা

তাদের মারতে চাই না-তাদের দ্বীপটাই শুধু পৃথিবী নয়-বাইরে আরও কত জায়গা আছে, কতরকম মানুষ আছে। তিনদিন বাদে তাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসা হল তাদের দ্বীপে-যাতে তারা গিয়ে অন্যদের বলতে পারে যে, সভ্য লোকরা তাদের মারেনি, বরং আদর করেছে। এরপর কী হল বলতে পারেন?

এস পি সাহেব বললেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি ঘটনাটা। পরদিন দেখা গেল সেই তিনজন জারোয়ার মৃতদেহসমুদ্রে ভাসছে।

প্রীতম সিং বললেন, অন্য জারোয়ারা তাদের মেরে ফেলেছে। তারা মনে করে, সভ্য লোকদের ছোঁয়া লেগে ঐ তিনজন অপবিত্র হয়ে গেছে। তাহলেই বুঝুন, ওরা কতটা ঘেন্না করে আমাদের।

দাশগুপ্ত বলল, তবে কি আমরা কিছুই করব না। এখানে চুপ করে বসে থাকব?

এস পি বললেন, উনি একটা বয়স্ক লোক। নিজে যদি ইচ্ছে করে সেখানে যেতে চান, তাহলে নিজেই তার ঠালা বুঝবেন। আমাদের কী করার আছে?

তা বলে আমরা লোকটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না? আমার কাছে দিল্লি থেকে অর্ডার এসেছে, ওঁকে সবরকমভাবে সাহায্য করার। স্যার, এক্ষুনি চলুন পুলিশ ফোর্স নিয়ে।

এস পি সাহেব বললেন, তারপর জারোয়ারা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুড়বে, সেগুলো কি আমরা খেয়ে হজম করে ফেলব?

প্রীতম সিং বললেন, বনের মধ্যে ওরা কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। তাহলে লড়াই লেগে যাবে।

দাশগুপ্ত বলল, দরকার হলে আমাদের গুলি চালাতে হবেই, উপায় কী?

এস পি সাহেব বললেন, আমরা শুধু শুধু ওদের মারব? কেন, ঐ ভদ্রলোককে কে ওখানে যেতে বলেছিল? সারা পৃথিবীতে রটে যাবে যে, আমরা আমাদের আদিবাসীদের গুলি করে মারি।

প্রীতম সিং মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, বাঙালি ছাড়া এমন উদ্ভট শখ আর কারুর হয় না। জারোয়াদের গুলি করে মারা আমিও সমর্থনা করি না।

দাশগুপ্ত এস পি সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, স্যার, একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

এস পি সাহেব বললেন, আমাকে তাহলে দিল্লিতে হোম সেক্রেটারির কাছে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। গভর্নমেন্টের হুকুম ছাড়া আমি কিছু করতে পারব না।

কিন্তু স্যার, দিল্লি থেকে হুকুম আসতে অন্তত একদিন লেগে যাবে।

এস পি সাহেব বললেন, একদিন অপেক্ষা করতেই হবে। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

দাশগুপ্ত প্রায় কান্না-কান্না গলায় বলল, ওঁর সঙ্গে সেই ছোট ছেলেটিও আছে। হয়, হায়, এতক্ষণে ওদের কী হয়েছে, কি জানি।

৮. সন্তু জলে লাফিয়ে পড়ার পর

এদিকে সন্তু জলে লাফিয়ে পড়ার পরই ভাবল, তাকে কুমিরে ধরবে। সে ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু সাঁতার কাটতে হল না। সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ তাকে পাড়ে এনে পৌঁছে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠেই চলে এল একটা গাছের আড়ালে।

আর-একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর চাপা গলায় বললেন, তুমি বোকার মতন জলে লাফিয়ে পড়লে কেন? তোমাকে পোর্ট ব্লেয়ারে চলে যেতে বললুম না?

সন্তু বলল, তুমি কেন এলে?

আমি এসেছি, বেশ করেছি। আমি বুড়ো মানুষ, কোনও একটা বড় কাজের জন্য যদি আমি মরেও যাই, তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ, তোমার মাকে আমি বলে এসেছি তোমার কোনও বিপদ হবে না!

মা আমাকে বলে দিয়েছিলেন, সব সময় তোমার কাছাকাছি থাকতে!

আঃ! তুমি এমন গণ্ডগোল বাধালে! যাক গে, তুমি আমার পেছনে এসে দাঁড়াও! একটুও নড়বে না। কোনও শব্দ করবে না?

দুজনে খানিকক্ষণ কান খাড়া করে রইল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। বোধহয় জারোয়ারা এখনও তাদের আসার ব্যাপারটা টের পায়নি। সামনে থেকেই শুরু হয়ে গেছে ঘন জঙ্গল। ফাঁক নেই একটুও। এত ঘন জঙ্গলের মধ্যে গায়ে তীর লাগবার খুব ভয় নেই। একটু দূর থেকে তীর ছুঁড়লে কোনও না কোনও গাছে আটকে যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা বুঝতে পারল কাছাকাছি কোনও জারোয়া নেই। তখন পা টিপো-টিপে ওরা জঙ্গলের মধ্যে এগোতে লাগল। পায়ের তলার মাটি ভিজে

স্যাঁতসেঁতে। গাছ থেকে খসে পড়া অসংখ্য পাতা পচে নরম হয়ে আছে। এখানে যখন-তখন বৃষ্টি হয়।

কাকাবাবু ভাবছেন, সমুদ্রের ধার থেকে যত দূরে সরে যাওয়া যায়, ততই ভাল। এতবড় জঙ্গলের মধ্যে জারোয়ারা তাঁদের চট্ট করে খুঁজে পাবে না। জঙ্গলের মধ্যে দিনের বেলাতেও অন্ধকার।

কাকাবাবুর ক্রাচটা হঠাৎ এক জায়গায় নরম মাটিতে গেঁথে গেল। তিনি সেটা টেনে তুলতে গিয়ে তাল সামলাতে পারলেন না, পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে। সন্তু তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরল। তারপর সে নিজেই ক্রাচটা উপড়ে তুলল কাদা থেকে।

সন্তু ভাবল, কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়ে সব জায়গায় চলাফেরা করতে পারেন। না। এই রকম জঙ্গলের মধ্যে তো আরও অসুবিধে। তবু তিনি সন্তুর ওপর রাগারগি করেছিলেন। ভাগ্যিস সন্তু জোর করে চলে এসেছে!

কাকাবাবু একটা গাছে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সন্তু একটুখানি এগিয়ে দেখতে গেল। সব সময় গা-টা শিরশির করছে। দাশগুপ্ত বলেছিল, এখানকার জঙ্গল এত গভীর হলেও বাঘ-সিংহের কোনও ভয় নেই। সবচেয়ে বেশি ভয় মানুষের! সন্তুর খালি মনে হচ্ছে, কাছেই কারা যেন লুকিয়ে থেকে তাকে দেখছে। যে-কোনও মুহূর্তে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সন্তু ওপরের দিকে মুখ তুলে দেখতে লাগল, কোনও গাছের ওপর কেউ বসে আছে কি না। অবশ্য এখানকার গাছে ওঠা সহজ নয়। প্রায় সব কটা গাছই বিরাট-বিরাট লম্বা। প্রথম দিকে অনেকখানি উঠে গেছে সোজা হয়ে, কোনও ডালপালা নেই, মাথার কাছটা প্রকাণ্ড ছাতার মতন। এক-একটা গাছের বয়েস বোধহয় দুশো তিনশো বছর। গায়ে শ্যাওলা ধরে গেছে।

হঠাৎ দূরে একটা ছত্রছর শব্দ হল। ভয়ে কেঁপে উঠল সন্তু। কারা যেন ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়ে আসছে। এইবার তাহলে আসছে জারোয়ারা। আর উপায় নেই। সন্তুও ছুটে গিয়ে দাঁড়াল কাকাবাবুর পাশে। কাকাবাবুও আওয়াজটা শুনেছেন। তিনি সন্তুকে ধরে এনে দাঁড়ালেন দুটো বড় গাছের ফাঁকে। হাতে রিভলভার।

একটু বাদেই ওদের খানিকটা দূর দিয়ে ছুটে গেল দুটো হরিণ। তারপর আরও তিনটে। শেষ হরিণটি ওদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে আরও জোরে দৌড়ল।

কাকাবাবু বললেন, সাবধান, একটুও নড়বি না। হরিণগুলোকে তাড়া করে পেছনে মানুষ আসতে পারে।

কিন্তু কোনও মানুষ এল না। হরিণগুলো এমনিই দৌড়চ্ছে। সন্তু বোধহয় ইচ্ছে করলে একটাকে ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু এখন সে সময় নয়।

কাকাবাবু বললেন, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমাদের চেষ্টা করতে হবে জারোয়াদের চোখ এড়িয়ে যাতে সারা দ্বীপটা একবার ঘুরে দেখে আসা যায়। তারপর কাল সকালেই দাশগুপ্ত পুলিশ নিয়ে ফিরে আসবে, তখন আমরা চলে যাব। চলো এগেই

চারদিক দেখতে দেখতে খুব সাবধানে ওরা এগোতে লাগল। ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। খানিকটা দুরে একটা খুব আস্তে শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হয় জলের শব্দ। নিশ্চয়ই ওখানে কোনও ঝানা আছে। সন্তুর মনে পড়ে গেল তার খুব তেষ্টা পেয়েছে। তার গায়ের সমস্ত জামা-প্যান্ট ভিজে। জুতোটাও ভিজে থপথপ করছে। কিন্তু তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

কাকাবাবু সেই জলের শব্দটা লক্ষ করেই এগুতে লাগলেন। হঠাৎ সন্তু কিসে একটা হোঁচটি খেল।

নিচু হয়ে দেখল, একটা মানুষ। প্রকাণ্ড লম্বা একটা লোক, গায়ে কোনও জামা-কাপড় নেই। লোকটা মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, চোখ দুটো খোলা।

সন্তু ভয়ে আঁ করে শব্দ করতে গিয়ে নিজেই মুখে হাত চাপা দিল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী হল?

সন্তু কোনও উত্তর দিল না। ভয়ে তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কাকাবাবুও এবার লোকটাকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রিভলভারটা উঁচিয়ে ধরলেন সেদিকে।

লোকটি কিন্তু একটুও নড়ল-চড়ল না, কোনও কথাও বলল না। শুধু খোলা দু, চোখে যেন কটমট করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

কাকাবাবু বুকে লোকটির গায়ে হাত দিয়েই বললেন, এ তো মরে গেছে দেখছি।

কাকাবাবু এবার লোকটির পাশে বসে পড়লেন। লোকটির গায়ে কোনও দাগ নেই, কোনও ক্ষত নেই, তাহলে মরল কী করে? লোকটার মাথার চুল নিগ্রোদের মতন, কুচকুচে কালো রঙ, হাত দুটো বেশ লম্বা, আর বুকখানা যেন মনে হয়। পাথরের। এমন একটা জোয়ান লোক এমনি-এমনি মরে গেল?

কাকাবাবু লোকটাকে উল্টে দিলেন। তখন দেখা গেল, তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি রক্ত জমে আছে। সেখানে একটা গর্তের মতন।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, গুলি! এর ঘাড়ের মধ্যে গুলি ঢুকে গেছে। সর্বনাশ।

সন্তু এত কাছ থেকে কোনওদিন কোনও মরা মানুষ দেখেনি। সে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটাও কথা বলতে পারছে না।

কাকাবাবু বললেন, একে গুলি করে মেরেছে। তার মানে সেই সাহেবগুলোও এই দ্বীপে নেমেছে। আমি বলেছিলাম না? ওরা আমাদের আগে এসে পৌঁছে গেছে। সন্তু, আমাকে টেনে তোলা!

কাকাবাবুর একটা পা কাটা বলে উনি একবার বসে পড়লে চট্ করে নিজে থেকে উঠতে পারেন না। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, সন্তু সেই হাত ধরে টেনে তুলল তাঁকে।

কাকাবাবু বললেন, আমাদের আবার চট করে লুকিয়ে পড়তে হবে। এখন আমাদের দু দিক থেকে বিপদ। জারোয়ারা দেখলে মারবে, আর সাহেবগুলো দেখলেও আমাদের ছেড়ে দেবে না।

দুজনেই একটা ঝোপের আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও কোনও শব্দ নেই, শুধু দুরের একটা ঝর্নার জলের শব্দ ছাড়া। তবু মনে হচ্ছে যেন খুব কাছাকাছি কেউ দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ্য করছে। সব দিকে এমন ঘুটফুটে অন্ধকার যে, কিছুই দেখা যায় না। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

সন্তুর গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে। জলতেষ্টায় মনে হচ্ছে যেন বুকটা ফেটে যাবে। ঘাড়ের কাছে অনবরত কটা মশা কামড়াচ্ছে। একবার সে চটাস করে মশা মারল।

কাকাবাবু বললেন, উঁহু! শব্দ করো না।

সন্তু বলল, কাকাবাবু, আমি জল খাব।

কাকাবাবু বললেন, আমারও জলতেষ্টা পেয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকেও তো কিছু লাভ নেই। চলো, আমরা আস্তে আস্তে ঝর্নাটার দিকে এগোই।

অন্ধকারে কোথায় পা পড়ছে, তা বোঝবার উপায় নেই। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখে নিতে হচ্ছে সামনে কোনও বড় গাছ আছে কি না। তাও গাছে মাথা ঠুকে গেল।

কয়েকবার। কাকাবাবুর ক্রাচটা প্রায়ই জড়িয়ে যাচ্ছে বুনো লতায়, সেগুলো টেনে-টেনে ছিড়তে হচ্ছে।

বেশ খানিকটা যাবার পর ঝর্নাটা চোখে পড়ল। এখানে গাছপালা কিছু কম বলে চাঁদের আলো এসে জলে পড়েছে, তাই অন্ধকার এখানে পাতলা। বনটি বেশ চওড়া, জলে স্রোত আছে।

এতক্ষণ অন্ধকারে থেকে বিচ্ছিরি লাগছিল, তাই সন্তু দৌড়ে চলে গেল ঝর্নাটার কাছে। ঝর্নার ধারে বালি ছড়ানো, বেশ ঝকঝকে, পরিষ্কার। সন্তু জলের মধ্যে এক পা দিয়েই আবার উঠে এল তাড়াতাড়ি। এত জোর স্রোত যে, তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সে উবু হয়ে মাথাটা কুঁকিয়ে চুমুক দিয়ে জল খেয়ে নিল খানিকটা। জলটা ঠাণ্ডা নয়, একটু-একটু গরম, আর স্বাদটাও কষা-কষা। তবু পেট ভরে জল খেয়ে নিল সন্তু। সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। এতক্ষণ খিদের কথা মনেই পড়েনি।

কাকাবাবু ঝর্নার ধারে বসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। জলের মধ্যে গিয়ে পড়ার আগেই সন্তু তাঁর পিঠের জামা টেনে ধরল। তাতে কাকাবাবু নিজেকে সামলে নিতে পারলেন বটে, কিন্তু একটা সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঘটে গেল। হুমড়ি খাবার সময় কাকাবাবুর ডান হাতের ক্রাচটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল জলে, আর অমনি স্রোতে সেটা ভেসে গেল। সন্তু বনের ধার দিয়ে খানিকটা দৌড়ে গেল তবু সেটাকে ধরতে পারল না, একটু পরেই একটা দপ্ত বড় পাথর, সেটা ডিঙানো যায় না। ডান পাশ দিয়ে ঘুরে যখন আবার ঝর্নাটার কাছে এল, তখন ক্রাচটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সন্তু ফিরে আসতেই কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, পেলি না?

না।

কাকাবাবু হতাশভাবে বললেন, যাঃ, কী হবে এখন? ক্রাচ ছাড়া কাকাবাবু এক পাও চলতে পারেন না। বাঁ হাতেরটা রয়েছে বটে, কিন্তু একটা নিয়ে হাঁটতে গেলে একটু বাদেই বগলে

দারুণ ব্যথা হয়ে যায়। এমনিতেই বিপদে পড়লে কাকাবাবু দৌড়তে পারেন না, এরপর যদি হাঁটতেও না পারেন, তাহলে কী হবে?

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলেন। তারপর আজিলা ভরে খানিকটা জল নিয়ে এলেন মুখের কাছে। প্রথমে একটু জিভ ঠেকিয়ে স্বাদ নিলেন, তারপর বললেন, এটা একটা হট ওয়াটার স্প্রিং। কাছাকাছি কোনও জায়গায় পাহাড় ফুড়ে বেরিয়েছে। জলে অনেকটা গন্ধক আর লোহা মেশানো আছে। তাতে অবশ্য কোনও ক্ষতি হবে না, এ-জল খাওয়া যায়।

সন্তুর হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন কাকাবাবু। তারপর সন্তুর কাঁধে ভর দিয়েই এগোতে লাগলেন ঝর্নার ধার দিয়ে। একটু পরে বললেন, কোনও গাছের ডাল ভেঙে একটা লাঠি বানিয়ে নিতে হবে অন্তত।

সন্তু বলল, আমি এক্ষুনি বানিয়ে দিচ্ছি।

কাছেই একটা গাছের ডাল ধরে সে টান মারল। সেটা কিন্তু ভাঙল না। দারুণ শক্ত। সন্তু ডালটা ধরে ঝুলে পড়ল। সেটা নুয়ে পড়ছে, কিন্তু ভাঙছে না কিছুতেই।

কাকাবাবু বললেন, ছুরি দিয়ে কাটতে হবে। এখানকার বেশির ভাগ গাছই প্যাডোক কিংবা সিলভার উড, খুব ভাল কাঠ হয়।

সন্তুর পকেটে একটা ছোট্ট ছুরি আছে। তাতে বেশি মোটা ডাল কাটা যাবে না। তবু সে চেষ্টা করতে গেল, সেই সময় শুনতে পেল একটা অদ্ভুত শব্দ। কেউ যেন খুব জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। অনেকখানি রাস্তা দৌড়ে এলে যে-রকম নিশ্বাস পড়ে।

দুজনেই কান খাড়া করে শুনল আওয়াজটা। এক-একবার থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। খুব কাছেই। শব্দটা লক্ষ করে এগিয়ে যেতেই দেখল একটা লোক শুয়ে আছে মাটিতে।

তার দেহটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে, আর মুখটা বেরিয়ে আছে বাইরে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ঝর্নাটার দিকে আর ঐ রকম নিশ্বাস ফেলছে।

এর চেহারাও আগের লোকটার মতন, কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোয় বোঝা যায়, এর সারা গায়ে রক্ত মাখা।

কাকাবাবু বললেন, এর গায়েও গুলি লেগেছে। কিন্তু লোকটা এখনও বেঁচে আছে।

ওরা গিয়ে লোকটার কাছে দাঁড়াল। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ওদের দিকে, সেই দৃষ্টিতে দারুণ ঘৃণা।

কাকাবাবু বললেন, আহা রে, লোকটা গড়িয়ে গড়িয়ে এতটা এসেছে। জল খাবার জন্য। আর এগোতে পারেনি। সন্তু, ওকে একটু জল এনে দাও তো!

সন্তু আজিলা করে খানিকটা জল নিয়ে এসে লোকটার মুখের ওপর ঢেলে দিল। লোকটা হাঁ করে আছে। যেটুকু জল মুখের বাইরে পড়েছে, তা জিভ দিয়ে চোটে নিচ্ছে। সন্তু তিন-চারবার ওকে জল এনে এনে দিল। কাকাবাবু ততক্ষণে লোকটার পাশে বসে পড়েছেন।

লোকটার পেটে আর কাঁধে আর পায়ে তিনটে গুলি লেগেছে। এর মধ্যে পেটের জখমটাই সাজ্ঘাতিক।

কাকাবাবু বললেন, এখনও চেষ্টা করলে লোকটাকে বাঁচানো যায়।

তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করে তুলোর মতন পেটের ক্ষতটাতে গুঁজে দিলেন। তারপর দু পায়ের মোজা খুলে ফেলে সেগুলো ছিঁড়ে গিঁট বেঁধে

সন্তু পাশে বসে আছে। হঠাৎ লোকটা একটা হাত তুলে সন্তুর গলা টিপে ধরল। সন্তু কিছু বোঝবার আগেই আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতন বসে গেল তার গলায়। লোকটার শরীর থেকে কতখানি রক্ত বেরিয়ে গেছে, তবু তার গায়ে অসম্ভব জোর। সন্তু দু হাত দিয়ে

টেনেও লোকটার হাত ছাড়াতে পারছে না। তার দম আটকে আসছে, সে এবার মরে যাবে! সে কোনও শব্দ করতে পারছে। না। কাকাবাবু অন্যদিকে ফিরে এক মনে মোজা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বানাচ্ছেন, তিনি কিছু টেরও পেলেন না।

প্রাণপণ চেষ্টায় সন্তু একবার শব্দ করে উঠল, আঁ আঁ–

কাকাবাবু পেছন ফিরে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রিভলভারের বাঁট দিয়ে খুব জোরে মারলেন লোকটার হাতে। লোকটা হাত ছেড়ে দিল, সন্তু ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।

লোকটা তখন মুখখানা উঁচু করে কাকাবাবুর একটা হাত কামড়ে ধরল। কাকাবাবু সব কিছু ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন উঃ করে। তারপর অন্য হাত দিয়ে রিভলভারের বাঁটটা ঠিকে দিলেন লোকটার মাথায়। লোকটার কামড় আলগা হয়ে গেল, ঘাড় কাত করে চোখ বুজল।

কাকাবাবু হামাগুড়ি দিয়ে ঝর্না থেকে জল এনে এনে ঝাপটা দিতে লাগলেন সন্তুর চোখ-মুখে। আর ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগলেন, সন্তু, সন্তু!

একটু বাদে সন্তু চোখ মেলল। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে যেতেই কাকাবাবু বললেন, থাক থাক উঠতে হবে না। একটু শুয়ে থোক। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাকাবাবু আবার হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে জল এনে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন সেই লোকটির মুখে। সে কিন্তু আর চোখ খুলল না।

কাকাবাবু বললেন, লোকটা মরেই গেল নাকি? আমি ওকে মেরে ফেললাম?

তিনি লোকটার নাকের কাছে হাত নিয়ে বললেন, না, এখনও নিশ্বাস পড়ছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে। থাক।

এবার তিনি লোকটার ক্ষত জায়গাগুলো মুছে দিলেন। কিছু লতাপাতা ছিঁড়ে রস লাগিয়ে দিলেন সেখানে। তাঁর মোজার ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দিলেন পেটে। তারপর বললেন, পেট থেকে যদি রক্ত পড়া বন্ধ হয়, তাহলে বেঁচেও যেতে পারে।

সন্তু ততক্ষণে উঠে বসেছে। এখনও তার মাথা ঝিম-ঝিম করছে। সে ভেবেছিল সে মরেই যাবে। গলাটা ফুলে গেছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন লাগছে? কষ্ট হচ্ছে?

সন্তু বলল, না।

বাবাঃ, কী সাঙ্ঘাতিক?

সন্তু খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বলল, আমি ওকে জল খাওয়ালাম, তবুও আমাকে মারতে চাইল কেন? আমরা তো ওকে বাঁচাবারই চেষ্টা করছিলাম।

কাকাবাবু বললেন, ওরা আমাদের বিশ্বাস করে না। বাইরের যে-কোনও লোকই ওদের কাছে শত্রু।

আমার আর এখানে একটুও থাকতে ভাল লাগছে না।

কাল সকালেই আমরা চলে যাব। পুলিশের বোট আসবে।

যদি না আসে?

আসবে না কেন? নিশ্চয়ই আসবে। ওরা কি আমাদের ভুলে যেতে পারে? আমরা রাত্তিরটাতে সারা দ্বীপটা একবার ঘুরে দেখে আসব। রাত্তিরেই সুবিধে। তারপর ভোরবেলা আমরা সমুদ্রের ধারে লুকিয়ে বসে থাকব। লঞ্চ এলেই উঠে পড়ব চট্ করে

এত রকম বিপদের পরও কাকাবাবু দ্বীপটা ঘুরে দেখতে চান। ওঁর উৎসাহ কিছুতেই কমে না। ভয়ডর একটুও নেই। একটা ক্রাচ নেই, নিজে হাঁটতে পারছেন না, তবু এখনও হেঁটে বেড়াবেন।

সন্তু বলল, আমরা এখনি সমুদ্রের ধারে চলে যাই না কেন?

কাকাবাবু বললেন, বাঃ গোটা দ্বীপটা না-দেখেই চলে যাব? তাহলে এলাম কেন? সবটা না-দেখে ফিরব না।

আবার তিনি সন্তুর কাঁধ ধরে হাঁটতে লাগলেন। ঝর্নার পাশ দিয়ে-দিয়েই। কারণ বালির ওপরটা বেশ পরিষ্কার। পায়ে লতাপাতা আটকে যায় না। জ্যোৎস্নায় সামনেটাও দেখা যায়।

তবু বেশি দূর আর এগোনো হল না। খানিকটা বাদে হঠাৎ দেখা গেল, বনের মধ্যে এক জায়গায় জ্বলে উঠল একটা টর্চের আলো।

কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুকে এক ধাক্কা দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়লে মাটিতে। গড়াতে-গড়াতে ঝর্নার ধার থেকে সরে গিয়ে ঢুকে পড়লেন একটা ঝোপের মধ্যে। সন্তুও চলে এল কাকাবাবুর পাশে-পাশে।

অমনি গুড়ুম-গুড়ুম করে দুটো গুলির শব্দ হল।

সেই গুলির শব্দ যেন প্রতিধ্বনি তুলল। জঙ্গলের মধ্যে। যেন দূরে কোনও পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে শব্দগুলো ফিরে আসছে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ আর কোনও আওয়াজ নেই। সন্তু প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাকে, কিন্তু তাব বুকের মধ্যে টিপটপ শব্দ হচ্ছে, যেন সেটাই বাইরের লোক শুনে ফেলবে।

একটু বাদে শোনা গেল পায়ের শব্দ। একসঙ্গে অনেক লোকের। ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, যারা হাঁটছে, তাদের খালি পা নয়, তারা জুতো পরে আছে। লোকগুলো

আসছে। এদিকেই। মাঝে-মাঝে টর্চের আলো জ্বলেই নিভে যাচ্ছে। তারপর প্রায় সাত-আটজন লোক এসে দাঁড়াল কানটির ধারে। এরা সবাই সাহেব। না, সবাই নয়, একজনকে মনে হয় পাঞ্জাবী শিখ। তারা টর্চ ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখতে লাগল।

একজন ইংরিজিতে বলল, নিশ্চয়ই এখানে একটু আগে কেউ ছিল। আমি গলার আওয়াজ শুনেছি।

আর-একজন বলল, এই দ্যাখো, বালিতে পায়ের ছাপ।

আবার তারা টর্চের আলো ফেলল ঝর্নার দু দিকে।

কাকাবাবু আর সন্তু যদিও একটা বেশ ঘন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে, কিন্তু সেটা ঝর্না থেকে খুব দূরে নয়। ঐ সাহেবরা একটু ভাল করে খুঁজলেই সন্তয়া ধরা পড়ে যাবে। কাকাবাবু একহাতে রিভলভারটা তাক করে ধরে, অন্য হাতটা তার ওপর চাপা দিয়ে রেখেছেন।

সাহেবদের মধ্যে দুজনের হাতে রাইফেল, বাকিদের হাতে রিভলভার। আর পাঞ্জাবীর মতন চেহারার লোকটির হাতে টর্চ।

সন্তু টের পেল তার পায়ের কাছে কী যেন একটা নড়ছে। একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জিনিস তার গায় লাগছে। সাপ নাকি? কাকাবাবু যদিও বলেছিলেন যে, এখানকার সাপের বিষ নেই, কিন্তু সে-কথা সন্তুর তখন মনে পড়ল না। সে তাড়াতাড়ি পা-টা সরিয়ে নিল। এবার পা-টা পড়ল বেশ বড় একটা ঠাণ্ডা জ্যাত জিনিসের ওপর। দারুণ ভয় পেয়েও সন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করল না বটে, কিন্তু পা-টা আবার সরিয়ে নিতেই শুকনো পাতায় খচমচ শব্দ হল।

সঙ্গে-সঙ্গে টর্চের আলোটা ঘুরে গেল এদিকে।

কিন্তু সন্তুরা ধরা পড়ার আগেই একটা সাহেব ওয়া বলে চেঁচিয়ে উঠল। আর একজন উত্তেজিতভাবে বলল, ওরা আবার তীর ছুঁড়ছে। টার্চটা শিগগির নেভাও, বোকা!

তারপরই একসঙ্গে ছটা বন্দুক পিস্তল গর্জে উঠল। সন্তুরা বুঝতে পারল, ওদের পিছন দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসছে। কয়েকটা তীর গাছের ডালে লেগে আটকে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। জারোয়াদের সঙ্গে সাহেবদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সন্তুরা পড়ে গেছে মাঝখানে। যে-কোনও দিক থেকে গুলি কিংবা তীর এসে লাগতে পারে ওদের গায়ে। কিন্তু এখন কিছুই করার উপায় নেই।

সাহেবরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, তারা এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছে আর গুলি চালাচ্ছে। জারোয়ারা যাতে তাদের ওপর টিপ না করতে পারে। এর মধ্যে এও গোলাগুলির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে কোথা থেকে বেরিয়ে পড়ল এক পাল গো শুয়োর। তারা জীবনে কখনও এরকম শব্দ শোনেনি-একসঙ্গে হুড়মুড় করে ছুঁটে গেল ঝর্নার ধার দিয়ে। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা।

যুদ্ধ থেমে গেল মিনিট দিশেকের মধ্যেই। জারোয়ারা তীর ছোঁড়া বন্ধ করে পিছিয়ে যাচ্ছে।

একজন সাহেব বলল, লেটুস মুভ!

আর একজন সাহেব বলল, আমার গায়ে তীর লেগেছে। শিগগির তুলে দাও। ইঞ্জেকশন, ইঞ্জেকশন কার কাছে?

তারপর কিছুক্ষণ ফিসফাস। একটা কাচ ভাঙার শব্দ হল। একটু পরে বোঝা গেল, ওরা চলে যাচ্ছে।

আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর কাকাবাবু উঠে বসলেন। সন্তু উঠে প্রথমেই দেখল, তার পায়ের কাছের জিনিসটা কী। না, সাপ নয়, একটা মস্ত বড় ব্যাঙ, প্রায় আধ কিলো ওজন হবে। সন্তু জুতোর ঠোকর দিয়ে সেটাকে দূরে সরিয়ে দিল।

কাকাবাবু কোট থেকে মাটি আর শুকনো ডালপাতা ঝেড়ে ফেললেন। তারপর বললেন, আমরা দুজন সাহেবকে পালাতে দেখেছিলাম, কিন্তু এখানে এরা ছজন। তার মানে আগে থেকে কয়েকজন এসে অন্য দ্বীপে লুকিয়ে ছিল। আশ্চর্য জাত!

সন্তু বলল, কাকাবাবু, আস্তে কথা বলো, জারোয়ারা যদি কাছেই থাকে?

কাকাবাবু বললেন, না, সে সম্ভাবনা নেই। জারোয়ারা পালিয়েছে। তারা ভয় পেয়েছে। এরকম জিনিস কখনও তারা দেখেনি।

কী? বন্দুক? আগে বন্দুক দেখেনি?

না, বন্দুক নয়। আমি যতদূর শুনেছি, জারোয়ারা গুলি বন্দুককে ভয় পায় না। তারা মরতেও ভয় পায় না। কিন্তু এরকম ব্যাপার ওরা কখনও দেখেনি আগে।

কোন ব্যাপার? তুইও বুঝতে পারলি না। একজন সাহেব যে ইঞ্জেকশন ইঞ্জেকশন বলে চ্যাঁচাল, সেটা শুনিসনি?

হ্যাঁ, শুনেছি।

এবার সাহেবরা আটঘাটি বেঁধে এসেছে। সাহেবের জাত তো, কোনও ত্রুটি রাখে না। সবাই জারোয়াদের বিষাক্ত তীরকে ভয় পায়। ঐ তীর গায়ে বিধালে মানুষ মরে যায়। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, বিষেরও ওষুধ আছে। এমন কী, সাপের বিষও সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ দিয়ে নষ্ট করা যায়। ঐ সাহেবরা সেই ওষুধ নিয়ে এসেছে। কারুর গায়ে তীর লাগলেই ওষুধের ইঞ্জেকশন নিয়ে নিচ্ছে একটা করে। তীর খেয়েও কোনও সাহেব মরছে না, এই দেখে ভয় পেয়ে গেছে জারোয়ারা। এবার ওরা হরবেই।

কাকাবাবু হামাগুড়ি দিয়ে ঝর্নার কাছে এগিয়ে গেলেন। এদিক-ওদিক হাতড়িয়ে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলেন একটা তীর। খুব সাবধানে তীরটার

পেছনটা ধরে সেটাকে খুব সাবধানে ধুয়ে নিলেন জলে। তারপর সেটা তুলে বললেন, এই দ্যাখ। এমনিতে এটা এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র নয়।

সন্তু দেখল, তীরটা সত্যিই অন্যরকম। অনেকটা খেলবার তীরের মতন। তীরের ডগায় যে লোহার ফলক থাকবার কথা, এতে তা নেই। তীরটা বাঁশের, মুখটা খুব ছুঁচালো। তীরের পেছন দিকটায় পালকও লাগানো নেই।

কাকাবাবু বললেন, যদি বিষ না থাকে, তাহলে এরকম তীর আট-দশটাও যদি কারুর গায়ে বেঁধে, তাহলেও এমন-কিছু লাগবে না। বিষের জন্য সাহেবরা ইঞ্জেকশন নিয়ে নিচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে কী আর এমন বিষ পাওয়া যাবে? খুব সম্ভব জারোয়ারা স্ট্রিকনিন ধরনের বিষ ব্যবহার করে। সঙ্গে-সঙ্গে অ্যান্টিডোট নিলে সে-বিষ কোনও ক্ষতিই করতে পারে না। সাহেবরা বুদ্ধি করে সেই ওষুধ সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আমাদেরও আনা উচিত ছিল।

কাকাবাবু সেই তীরটা নিজের ব্যাগের মধ্যে ভরে নিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ঐ ছ-সাতটি সাহেব মিলে পাঁচ-ছাঁশো জারোয়াকে মেরে ফেলতে পারে। আমাদের উচিত এক্ষুনি পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে গিয়ে পুলিশকে এই খবর জানানো?

কিন্তু পোর্ট ব্লেয়ারে ফেরা হবে কী করে? সন্তু সেই কথাই ভাবল। এই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে সমুদ্রের দিকের রাস্তা খুঁজে পাওয়াই প্রায় অসম্ভব। সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছলেই বা কী লাভ? লঞ্চ কিংবা মোটরবোট কোথায় পাওয়া যাবে? দাশগুপ্তরা তো ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। কাল যদি দাশগুপ্ত পুলিশ সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে–

কাকাবাবু অনেকটা আপন মনেই বললেন, সাহেবরা এত আটঘটি বেঁধে এখানে এসেছে কেন? নিশ্চয়ই এখানে সাঙ্ঘাতিক কোনও দামি জিনিস ওআছে। এর আগে-আগে এসেছে বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু এদের বৈজ্ঞানিক বলে মনে হয় না, কোনও বৈজ্ঞানিক গুলি করে মানুষ মারে না। এরা নিশ্চয়ই ডাকাত-টাকাত হবে।

তারপর তিনি সন্তুর দিকে ফিরে উত্তেজিতভাবে বললেন, সন্তু, তোকে একটা কাজ করতে হবে। এর জন্য খুব সাহসের দরকার। ভয় পেলে একদম চলবে না। তুই সমুদ্রের ধারে চলে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাক। এখন জারোয়ারা সমুদ্রের ধারে পাহারা দেবার সময় পাবে না। তবু তুই খুব সাবধানে থাকবি। দাশগুপ্ত কাল কোনও সময় মোটরবোট নিয়ে আসবেই। তাকে সব বুঝিয়ে বলবি। দরকার হলে পঞ্চাশ-যাটজন পুলিশ নিয়ে ভেতরে ঢুকে আসে যেন। ঐ সাহেবগুলোকে আটকাতেই হবে। যে-কোনও উপায়ে হোক। যা, তুই এগিয়ে পড়।

সন্তু অবাক হয়ে বলল, আমি এক যাব?

হ্যাঁ।

আমি এক কেন যাব? না, তা হয় না।

বেশি কথা বলিস না। তোকে একাই যেতে হবে।

তুমি এখানে থাকবে? তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে।

সহজে পারবে না। আমি লুকিয়ে থাকব।

কাকাবাবু, আমি তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই যাব না। মা বলে দিয়েছেন, সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে।

সন্তু, অবুঝ হয়ো না। এখানে এখন দুজনের থাকার কোনও মনে হয় না। তাহলে দুজনেই মরব। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, আমি মরে গেলেও কী এমন ক্ষতি আছে! মানুষ তো এক সময় না এক সময় মরেই! তবু মরার আগে এই রহস্যটা জেনে যাওয়ার চেষ্টা করব। তোমাকে বাঁচতেই হবে। তাছাড়া, তুমি গিয়ে দাশগুপ্তকে খবর দিলে তারা হয়তো আমাকে বাঁচাবার চেষ্টাও করতে পারে।

কিন্তু তুমি তো একটা ক্রাচ নিয়ে বেশিক্ষণ হাঁটতেই পারবে না।

আমি রাত্তিরটা এখানেই ঝোপের মধ্যে শুয়ে থাকব। সকালবেলা একটা গাছের ডাল জোগাড় করে নেব ঠিকই। আমার অসুবিধে হবে না। সমুদ্রের ধারটাই এখন সবচেয়ে নিরাপদ।

কিন্তু আমি অন্ধকারের মধ্যে সমুদ্রের ধারে যাব। কী করে? রাস্তা হারিয়ে ফেলব।

সমুদ্রের কাছে যাওয়া তো খুব সোজা। এই ঝর্নাটা যখন পাওয়া গেছে। এটার ধার দিয়ে ধার দিয়ে গেলেই হবে। এই ঝর্নাটা নিশ্চয়ই সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। খুব সাবধানে যাবে কিন্তু।

সন্তুর বুক ঠেলে কান্না উঠে এল। সে কাকাবাবুর হাত চেপে ধরে বলল, কাকাবাবু, আমি যাব না। আমি তোমাকে একা ফেলে কিছুতেই যাব না।

কাকাবাবু সন্তুর মাথায় হাত রেখে ভারী গলায় বললেন, সন্তু, এবার তোমাকে এখানে আনাই ভুল হয়েছে। এতটা বিপদের কথা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখানে আমাদের দুজনের একসঙ্গে থাকা খুবই বিপজ্জনক। পুলিশকে একটা খবর দেওয়া খুবই দরকার।

তুমিও চলে আমার সঙ্গে।

আমি গেলে চলবে না। আমি ঐ সাহেবগুলোর ওপর নজর রাখতে চাই।

তুমি এক ওদের সঙ্গে কী করবে? যদি ওরা আবার এদিকে এসে পড়ে?

আমি লুকিয়ে থাকব, ওরা আমাকে দেখতে পাবে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি এখানেই থাকব, অন্য কোথাও যাব না।

তাহলে শুধু শুধু কেন একলা বসে থাকবে। না কাকাবাবু, তুমি চলো আমার সঙ্গে। আমি এক কিছুতেই যাব না।

কাকাবাবু এবার গভীর কড়া গলায় বললেন, সন্তু, তোমাকে যেতে বলছি, যাও! তুমি জানো না, আমার কথার নড়াচড় হয় না? আমি অনেক ভেবেচিন্তেই তোমাকে যেতে বলেছি। আমি এখানেই থাকব। যাও, এক্ষুনি রওনা হও!

সন্তু আর কথা বলার সাহস পেল না। এক পা এক পা করে চলতে শুরু করল। কয়েকবার পেছন ফিরে তাকাল, কিন্তু একটু বাদেই আর কাকাবাবুকে দেখতে পেল না। কাকাবাবুঝোপের অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। সন্তুও বড় পাথরটার ওপাশে চলে গেল।

ঝর্নার পাশে বালির ওপর হালকা চাঁদের আলো, তাতে সন্তুর ছায়া পড়েছে। সেই ছায়াটাই তার সঙ্গী। বন এত নিস্তব্ধ যে, এমনিতেই গা ছমছম করে। কোথায় আড়ালে গাছের ওপর জারোয়ারা লুকিয়ে আছে কে জানে। যে-কোনও সময় একটা তীর এসে গায়ে লাগতে পারে।

সন্তু তাড়াতাড়ি ঝর্নার পাড় থেকে সরে জঙ্গলে চলে গেল। ঝর্নার পাশে থাকলে দূর থেকেও তাকে দেখা যাবে। কিন্তু বনের মধ্যে আসার পর ছায়াটাও আর তার সঙ্গী রইল না।

মনের মধ্যে ভীষণ খারাপ লাগছে। কাকাবাবুকে এরকমভাবে ছেড়ে চলে যাওয়া কি ঠিক হল? একলা এই ভয়ংকর জঙ্গলের মধ্যে উনি কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবেন? নিজে ভাল করে হাঁটতেও পারেন না। অথচ কাকাবাবু যে কিছুতেই শুনবেন না। অন্য কারুর কথা।

ঝর্নাটা ক্রমশই চওড়া হচ্ছে। এখানে হাঁটাও খুব শক্ত। মাঝে-মাঝেই কাঁটাঝোপ। একটা বড় গাছের গায়ে একবার সন্তু হাত দিতেই তার হাত ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। গাছের গায়েও কাঁটা। খালি তার ভয় হচ্ছে। হোঁচটি খেয়ে পড়ে না যায়। তাকে সমুদ্রের ধারে পৌঁছতেই হবে।

হঠাৎ একটা আওয়াজে সে দারুণ চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠল। শব্দটা এমনই বিকট যে, শরীরের রক্ত প্রায় জল হয়ে যায়। প্রথমে মনে হল, যেন একসঙ্গে দু-তিনটে পাখি ডেকে উঠল। কিন্তু কোনও পাখি এরকম বিশ্রী সূরে ডাকে? আর এত জোরে? শব্দটা এই রকম : কিলা কিলা কিলা কিলা কিলা কিলা!

সন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু বাদেই সেই রকম আবার কিলা কিলা কিলা কিলা শব্দ উঠল। ডান দিক থেকে। আগের শব্দটা এসেছিল বাঁ দিক থেকে। এবার মনে হল, যেন কয়েকজন লোক উলু দিচ্ছে। কিন্তু শব্দটা শুনলেই গা শিউরে ওঠে।

তারপর চারদিক থেকে কিলা কিলা কিলা কিলা শব্দ উঠল। যেন শত শত লোক একসঙ্গে চিৎকার করছে। বনের সব দিক থেকে ঐ শব্দ করতে করতে কারা ছুটে আসছে। এর মধ্যেই দুমদুম করে গুলির শব্দ শুরু হয়ে গেল। তবু ঐ কিলা কিলা থামল না। সন্তু একটা পাথরের আড়ালে গুটিসুট মেরে বসে রইল। তার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে। তার মনে হচ্ছে যেন নরকের সব প্রাণীরা জেগে উঠে বন ঘিরে ধরছে।

বন্দুকের গুলির শব্দ কিন্তু একটু বাদেই থেমে গেল, কিন্তু কিলা কিলা শব্দ থোমল না। এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ঐ রকম শব্দ করে এক জায়গায় লাফাচ্ছে। তারপর শব্দটা একটু একটু করে দূরে সরে যেতে লাগল।

ব্যাপারটা কী হল, তা বোঝার চেষ্টা করল। সন্তু। তার শরীর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দু-হাত দিয়ে মুখটা ঘষতে লাগল জোরে জোরে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। গুড়ি মেরে ঝিনার পাশে এসে চুমুক দিয়ে জল খেয়ে নিল অনেকটা। তারপর তার পেট ব্যথা করতে লাগল।

সারাদিন কিছুই খায়নি, পেট খালি। শুধু ঝর্নার জল খাচ্ছে। জলেও কষা-কষা স্বাদ। জলের জন্যই পেট ব্যথা করছে কি না কে জানে।

কিলা কিলা আওয়াজটা এখনও শোনা যাচ্ছে, কিন্তু অনেকটা দূরে চলে গেছে। এবার। সন্তুর মনে হল যে, নিশ্চয়ই একসঙ্গে একশো-দুশো জারোয়া এসে সাহেবদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সাহেবরা গুলি করেও আটকাতে পারেনি। এবার ওরা সাহেবগুলোকে ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাহলে কাকাবাবুর কী হল? ওরা যদি কাকাবাবুকেও ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে? কিংবা যদি কাকাবাবুকে মেরে ফেলে?

সন্তুর ভীষণ ইচ্ছে হল, কাকাবাবুকে আর-একবার দেখে আসে। যদিও কাকাবাবু তাকে হুকুম দিয়েছেন সমুদ্রের কাছে যেতে, কিন্তু সন্তু তক্ষুনি যেতে পারবে না কিছুতেই। সে আবার উল্টে দিকে ফিরল।

এখন আর সন্তু গ্রাহ্যই করছে না কেউ তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কি না। সে বালির ওপর দিয়ে তীরের মতন ছুটতে লাগল। পেটের ব্যথাটা ক্রমেই বাড়ছে, সে দু-হাতে চেপে ধরে রাখল পেট।

সেই ঝোপটার কাছাকাছি এসেই সে ডাকল, কাকাবাবু কাকাবাবু!

কোনও উত্তর পেল না।

সন্তু হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল। ঝোপের মধ্যে। কাকাবাবু সেখানে নেই। এর মধ্যে তিনি কোথায় গেলেন? কাকাবাবু যে বলেছিলেন, এ-জায়গাটা ছেড়ে যাবেন না? সন্তু এদিক-ওদিক ঘুরে কাকাবাবুর নাম ধরে ডাকতে লাগল। কাকাবাবুর কোনও চিহ্নই নেই। সন্তু চলে এল ঝর্নার পাশে। দূরে কিলা কিলা শব্দ শোনা যাচ্ছে, এখন শব্দটা এক জায়গায় গিয়ে থেমেছে মনে হচ্ছে।

সন্তুর দৃঢ় বিশ্বাস হল জারোয়ারা কাকাবাবুকেও ধরে নিয়ে গেছে। সে আর কোনও কিছুই চিন্তা করল না, সেই শব্দটা লক্ষ্য করে ছুটল।

অন্ধকারের মধ্যে সন্তু ছুটছে তো ছুটছেই। নদীর ধারে বালির ওপরে মাঝে মাঝে বড়-বড় পাথর আর কাঁটাগাছের ঝোপ, কিন্তু সন্তু কোনও বাধাই মানছে। না। কাকাবাবুকে ফেলে রেখে সে যাবে না কিছুতেই। যদি কোনওক্রমে সে এখান থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরতেও পারে, তাহলে বাড়িতে মা, বাবা, আর সবাই বলবেন, তুই কাকাবাবুকে দ্বীপে রেখে নিজে চলে এলি? তুই এত কাপুরুষ? না, যদি মরতে হয় তো কাকাবাবুর সঙ্গে সন্তু নিজেও মরবো।

কিলা কিলা কিলা কিলা শব্দটা এখনও দূরে শোনা যাচ্ছে। ঐ শব্দটা শুনলেই ভয়ে রক্ত হিম হয়ে যায়। মানুষের গলার আওয়াজ যে এরকম হতে পারে, নিজের কানে না শুনলে সন্তু বিশ্বাস করত না কিছুতেই। যেন মুখের মধ্যে একটা লোহার জিভা নিয়ে কেউ চ্যাঁচাচ্ছে!

সাহেবরা এতগুলি বন্দুক নিয়ে এসেও হেরে গেল জারোয়াদের কাছে। ওরা একসঙ্গে দু-তিনশো জন এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাহেবদের ওপর। এখন বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। কাকাবাবু কী করে পড়ে গেলেন ওদের মধ্যে? কাকাবাবুর একটা পা নেই, একটা ক্রাচও নদীর জলে ভেসে গেছে, তিনি হাঁটতে পারবেন। না। ওরা কি কাকাবাবুকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাচ্ছে? ইস, কত কষ্ট হচ্ছে তাঁর। কাকাবাবু যদি এর মধ্যে মরে গিয়ে থাকেন?

সন্তু আরও জোরে দৌড়তে গেল। তার পেটের মধ্যে দারুণ ব্যথা করছে, দম ফুরিয়ে আসছে, তবু সে কিছুতেই থামবে না। কিন্তু একটু পরেই সন্তু একটা বড় পাথরে দারুণ জোরে হোঁচটি খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল। আর একটা পাথরে তার মাথাটা এমন জোরে ঠুকে গেল যে, সে সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে c কাঢঠে।

অজ্ঞান অবস্থায় সন্তু উপপুড় হয়ে পড়ে রইল ঝর্নাটার ধারে। সেই অবস্থাতেই তার বমি হতে লাগল। মুখ দিয়ে গল গল করে বমি বেরিয়ে আসছে তো আসছেই। সন্তুর জামাটামা সব বমিতে মাখামাখি হয়ে গেল। অজ্ঞান অবস্থায় আর মানুষের কোনও ভয় থাকে না।

এখন আর সাহেবদের ভয় নেই, জারোয়াদের ভয় নেই। খুব শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়ার মতন সন্তুর চোখ দুটো বোজা।

খানিকটা বাদে একপাল হরিণ। এল সেই ঝর্নার জল খেতে। এখানকার জঙ্গলে বাঘ সিংহের মতন কোনও হিংস্র প্রাণী নেই বলে হরিণের সংখ্যা খুব বেশি। হরিণগুলো সন্তুকে দেখেও কোনও ভয় পেল না। কয়েকটা হরিণ সন্তুর কাছে এসে তার গায়ের গন্ধ ওঁকল! আবার তারা ফিরে গেল বনের মধ্যে।

তারপর বিরঝির করে বৃষ্টি নামল। সন্তু ভিজতে লাগল সেই বৃষ্টিতে। সমস্ত জঙ্গল জুড়ে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে, তার মধ্যে সেই কিলা কিলা শব্দটা আর শোনা যায় না।

এখানকার বৃষ্টি হঠাৎ আসে, হঠাৎ থেমে যায়। এই বৃষ্টিও থেমে গেল একটু বাদে। কিন্তু বৃষ্টিতে ভেজার জন্য সন্তুর জ্ঞান ফিরে এল। সে উঠে বসল। ধড়মড়িয়ে। সে কোথায় আছে, কেন শুয়ে আছে-প্রথমে এসব কিছুই তার মনে এল না। একটুক্ষণ বসে রইল বিম দিয়ে, তারপর সব মনে পড়ল। সে শিউরে উঠল একেবারে। সে এরকম ফাঁকা জায়গায় শুয়ে ছিল? যে-কোনও জারোয়ার চোখে পড়লে একেবারে শেষ হয়ে যেত। সে তাড়াতাড়ি চারদিকে তাকিয়ে দেখল। না, কোথাও কেউ নেই। সেই কিলা কিলা শব্দটা এখন একেবারে থেমে গেছে।

বমি হয়ে যাওয়ার জন্য সন্তুর পেটের ব্যথাটা একদম সেরে গেছে। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। শুধু মাথার এক জায়গায় ব্যথা। সেখানে হাত দিয়ে দেখল, চুলের মধ্যে এক জায়গায় চট্চট করছে। রক্ত বেরিয়ে চুলের মধ্যে জমে আছে। সন্তুর হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। বাড়ি থেকে কত দূরে এই বিদঘুটে জঙ্গলের মধ্যে সে একা পড়ে আছে। কী করে বাঁচবে জানে না। কাকাবাবু কোথায় তার ঠিক নেই। কাকাবাবুকেন এইসব জায়গায় আসেন?

আবার সন্তু লজ্জা পেয়ে গেল। কাকাবাবু তো তাকে জোর করে আনেননি। সে-ই তো ইচ্ছে করে এসেছে অ্যাডভেঞ্চারের লোভে। এখন বিপদে পড়ে সে কাঁদছে। কেন? কেঁদে কোনও লাভ নেই, তাকে বাঁচার চেষ্টা করতেই হবে।

চোখের জল মুছে ফেলে সন্তু গেল ঝর্নার ধারে। ভাল করে বমিটমি ধুয়ে ফেলল। এখানকার জলটা বেশ গরম। যাকে উষ্ণ প্রস্রবণ বলে, এই ঝর্নাটা বোধহয় তাই। এর জল খেয়েই সন্তুর পেট ব্যথা করছিল। কিন্তু উপায় তো নেই। আবার আজিলা করে খানিকটা জল তুলে সন্তুকে খেতে হল। তার খুব তেষ্টা পেয়েছিল।

আবার সে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। কিলা কিলা শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলেও যে-দিক থেকে শব্দটা আসছিল, সন্তু যেতে লাগল সেই দিকে। এখন আর দৌড়তে পারছে না। হাঁটছে আস্তে আস্তে।

খানিকটা যাবার পর সে জঙ্গলের মধ্যে একটা আলো দেখতে পেল। সেই আলোটা দেখেও ভয় পাবার কথা। এই জঙ্গলের মধ্যে এরকম আলো আসবে কোথা থেকে? একদম নীল রঙের আলো। গাছপালা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে সেই আলোর ছটা। কালীপুজোর সময় ম্যাগনেসিয়ামের তার পোড়ালে এরকম নীল আলো হয়। সন্তু যত এগোতে লাগল ততই আলোটা উজ্জ্বল হতে লাগল। যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সন্তু কাকাবাবুর কাছে শুনেছিল যে, জারোয়ারা আগুনই জ্বালাতে জানে না। তা এরকম আলো এখানে কে জ্বেলেছে?

আলোটা দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে। তাই সন্তু নদীর ধার ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে সেই দিকে এগোল। আরও খানিকটা যাবার পর সে থমকে দাঁড়াল। যা দেখল, তাতে তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার মতন অবস্থা। বুকের মধ্যে এত জোর দুম দুম শব্দ হচ্ছে যেন বাইরে থেকেও শোনা যাবে।

জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। তার পাশে একটা গোল জিনিস দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই গোল জিনিসটা একটা একতলা বাড়ির সমান। সবচেয়ে আশ্চর্য তাঁর আগুনটা। এরকম অদ্ভুত আগুনের কথা সন্তু কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। আগুনটা

নানা রঙের। বেশির ভাগই একদম নীল, তাই দূর থেকে নীল রঙের আলো দেখা যায়। কিন্তু ঐ নীল আগুনের মধ্যে আবার লক লক করছে। কয়েকটা লাল, সবুজ আর গোলাপী রঙের শিখা। গ্যাসের আগুন নিয়ে কালাইন্টালাইয়ের কাজ হয় যে-সব দোকানে, সেখানে সন্তু অনেকটা এরকম নীল রঙের আগুন দেখেছে, কিন্তু সবুজ কিংবা আলতার মতন টকটকে লাল রঙের আগুনের কথা কে কবে শুনেছে? ঐ গোল জিনিসটা কী? ওটার মধ্যে যেন অনেকগুলো জিনিস আছে, সেগুলো থেকে আলাদা-আলাদা আগুন বেরুচ্ছে। যেন একটা আগুনের ফুলের তোড়া। ওটার দিক থেকে সহজে চোখ ফেরানো যায় না।

তবু কোনওরকমে চোখ ফিরিয়ে সন্তু দেখল, সেই গোল আগুনটা থেকে অনেক দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতিতে সার বেঁধে বসে আছে কয়েক শো জারোয়া। ওরা বসেছে মাটিতে হাঁটু গোড়ে, সকলের শরীর সোজা। আর ওদের সামনে পড়ে আছে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সাহেবগুলো। নীল আলোয় জায়গাটা দিনের বেলার মতন পরিষ্কার। সব স্পষ্ট দেখা যায়।

সন্তু গুড়ি মেরে আরও একটু সামনে এগিয়ে গেল। এখন সে আর নিজের প্রাণের কথা চিন্তাই করছে না। সে দেখতে চায় ওখানে কাকাবাবুও আছেন কি না। খুব শক্ত কোনও জংলী লতা দিয়ে সাহেবগুলোর হাত-পা একসঙ্গে এমনভাবে বাঁধা যে, তারা নড়তে-চড়তে পারছে না। কিন্তু কাকাবাবুতো ওদের মধ্যে নেই। তাহলে কি কাকাবাবুকে আগেই মেরে ফেলেছে?

ফাঁকা জায়গাটার এক পাশে। কতগুলো ঘর রয়েছে। ঘরগুলো গাছের ডাল আর লতা দিয়ে তৈরি করা। সেই সব ঘর থেকে কিছু কিছু জারোয়া মেয়ে আর বাচ্চা বেরিয়ে আসছে, কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে সাহেবদের। তারপর মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করছে। একটা জারোয়া মেয়ে একটা লম্বা শুকনো গাছের ডাল নিয়ে এগিয়ে গেল সেই আগুনটার কাছে। দূর থেকে সে ডালটা ঢুকিয়ে দিল আগুনের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা দপ করে জ্বলে উঠল। মেয়েটি সেই জ্বলন্ত ডালটা নিয়ে ফিরে এল আবার। এই ডালের আগুনটা কিন্তু সাধারণ আগুনের মতনই, নীল নয়। মেয়েটি সেই আগুন নিয়ে ঢুকে গেল একটা ঘরের মধ্যে।

সন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে, বুঝতে পারছে না। কাকাবাবুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কাকাবাবুকে এরা মেরে বনের মধ্যে কোথাও ফেলে রেখে এসেছে? কিন্তু সাহেবগুলোকে যখন নিয়ে এসেছে, তখন কাকাবাবুকেই বা আনবে না কেন? তাহলে কি কাকাবাবু ধরা পড়েননি, তাহলে কাকাবাবু গেলেন কোথায়? কাকাবাবু যেখানটায় লুকিয়ে ছিলেন, সন্তু সে-জায়গাটা খুঁজে দেখেছে। কাকাবাবু একটা ক্রাচ নিয়ে বেশিদূর যেতেও পারবেন না। তাহলে ব্যাপারটা কী হল?

সাহেবগুলোকে ওরকমভাবে হাত-পা বেঁধে রাখা হলেও ওদের মুখে কোনও ভয়ের চিহ্ন নেই। কেউ কান্নাকাটিও করছে না। জারোয়ারা সবাই একদম চুপ করে বসে আছে। সাহেবরা কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। সন্তু ইংরিজি ভালই জানে, কিন্তু সাহেবদের মুখের উচ্চারণ অনেক সময় বুঝতে পারে না। তবু একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করল। সে টুকরো টুকরো কয়েকটা কথা শুনতে পেল-দিজ বেগারস উইল সার্টেনলি কিল আস...দ্যাট মেরিওরাইট...ইনভেলুয়েবল...সো নীয়ার...

একজন সাহেব পাশ ফিরে শুতেই একজন জারোয়া উঠে গিয়ে তাকে আবার চিৎ করে দিল। কচ্ছপকে যেমন চিৎ করে রাখা হয়, এদেরও তেমনি চিৎ হয়েই থাকতে হবে।

জারোয়াদের দেখলেই মনে হয় তারা যেন কিসের জন্য অপেক্ষা করছে। ওরা যদি সাহেবগুলোকে মারতে চায়, তাহলে তো মেরে ফেললেই পারে। দেরি করছে কেন?

সন্তু নিশ্বাস ফেলছে খুব আস্তে-আস্তে। একটুও নড়াচড়া করতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু এখানেই বা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? কাকাবাবু এখানে নেই, তা বোঝাই যাচ্ছে। মনে হয় ভোর হতেও আর দেরি নেই। বারবার সে সেই গোল আগুনটার দিকে তাকাচ্ছে। ওই দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে—যদিও চোখটা একটু জ্বালা-জ্বালা করে। তবু যেন মনে হয়; ওটার মধ্যে চুম্বক আছে। আগুন যে এত সুন্দর হয়, সন্তু তা জানত না। সবুজ আগুন? এক-একবার মনে হয় যেন রঙিন কাগজ। কিন্তু কাগজ নয়, সত্যিকারের আগুন। একটু আগেই তো একজন মেয়ে ঐ আগুন থেকে একটা গাছের ডাল জ্বলিয়ে নিল।

আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। কাকাবাবুকে খুঁজে বার করতেই হবে। কিন্তু এত বড় জঙ্গলের মধ্যে কোথায় সে কাকাবাবুকে খুঁজে পাবে। তবু শেষ পর্যন্ত চেষ্টা না করে সন্তু ছাড়বে না।

হঠাৎ সন্তুর একটা কথা খেয়াল হল। একটা দারুণ সুযোগ। এখন যদি কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে তারা খুব সহজেই পালিয়ে বেঁচে যেতে পারে। জারোয়ারা সব এখানে, তারা জঙ্গলের মধ্যে খুঁজবে না। ঐ সাহেবগুলোর একটা মোটরবোট নিশ্চয়ই সমুদ্রের ধারে কোথাও আছে। সেই বেটটায় চেপেই তো তারা পালাতে পারে। এখান থেকে। সাহেবগুলোকে ফেলে তাদের মোটরবোট নিয়েই যেতে হবে।কিন্তু তাতে কোনও দোষ নেই, সাহেবরা তো তাদের শত্রু!

সন্তু পা টিপে-টিপে আস্তে আস্তে পিছিয়ে যেতে লাগল। আরও খানিকটা দূরে গিয়েই সে দৌড় মারবে। কিন্তু তার যাওয়া হল না। হঠাৎ জারোয়াগুলো শব্দ করে উঠে দাঁড়াল। আবার তারা বিকটভাবে সেই কিলা কিলা কিলা কিলা শব্দ করে উঠল। সন্তু কেঁপে উঠল একেবারে। জারোয়ারা কি তার কথা টের পেয়ে গেছে? সন্তু দৌড়ে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু জারোয়ারা তেড়ে এল না। তার দিকে। সেখানেই দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাতে লাগল। ব্যাপারটা কী ঘটছে তা দেখবার জন্য সন্তু আর কৌতূহল দমন করতে পারল না। আস্তে আস্তে আবার মাথা উঁচু করল।

এবারে সেখানে রয়েছে আর-একজন নতুন লোক। পাতার ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে সেই লোকটি ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই জারোয়ারা ওরকম চিৎকার করছে ঠিক যেন জয়ধ্বনি দেবার মতন। লোকটি একটি হাত উঁচু করে আছে ওদের দিকে।

লোকটি অসম্ভব বুড়ো। মনে হয় নব্বই কিংবা একশো বছর বয়েস। ছোটখাট্রো চেহারা, পিঠটা একটু বেঁকে গেছে। মাথার চুল ধপধাপে সাদা, মুখেও সাদা দাড়ি। লোকটির ভুরু দুটিও পাকা। লোকটি একটি লাল রঙের ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরে আছে গায়ে একটা লাল রঙের চাদর। অন্য কোনও জারোয়া জামা কাপড় কিছুই পরে না। এই বুড়ো

লোকটিকে জারোয়া বলে মনেও হয় না, গায়ের রঙ বেশ ফিসা, মাথার চুলও কোঁকড়ানো নয়। এ লোকটা কে? এ কি জারোয়াদের রাজা?

লোকটি আস্তে আস্তে হেঁটে এসে সাহেবগুলোর কাছে দাঁড়াল। খুব ভাল করে দেখতে লাগল তাদের মুখগুলো। আর মাঝে-মাঝে মাটিতে চিক চিক করে থুতু ফেলতে লাগল। তারপর মুখ তুলে কী যেন জিজ্ঞেস করল জারোয়াদের। চার-পাঁচজন জারোয়া একসঙ্গে উত্তর দিল।

একজন সাহেবের পাশে তার বন্দুকটা পড়ে ছিল। বুড়ো লোকটি নিজের হাতে তুলে নিল বন্দুকটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর টুক টুক করে হেঁটে চলে গেল সেই গোল আগুনটার কাছে। বন্দুকটা ছুঁড়ে দিল আগুনের মধ্যে। আবার জারোয়াদের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে অদ্ভুত ভাষায় কী যেন বলল।

অমনি চার-পাঁচজন জারোয়া এগিয়ে এসে একজন সাহেবকে মাটি থেকে উঁচু করে তুলল। তারপর চ্যাংদোলা করে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল বুড়োটির দিকে। সাহেবটা এবার চ্যাঁচাতে লাগল, হেই হোয়াট আর য়ু ডুইং-লীভ মি অ্যালেন। হেই!

জারোয়ারা সাহেবটিকে বুড়ো লোকটির কাছে নিয়ে এল। বুড়ো লোকটি হাত তুলে দেখাল আগুনের দিকে। তারপর সন্তু কিছু বোঝবার আগেই জারোয়ারা সাহেবটিকে ছুঁড়ে দিল আগুনের মধ্যে। ঠিক যেমনভাবে লোকে জলের মধ্যে পাথর ছোড়ে। শেষ মুহূর্তে সাহেবটি প্রচণ্ডভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিল। অ আ করে। আগুনের মধ্যে পড়েই সব থেমে গেল। তার আর কোনও চিহ্ন রইল না। একটু ধোঁয়া পর্যন্ত বেরুল না।

সন্তু দু হাতে চোখ ঢেকে ফেলল। চোখের সামনে এরকমভাবে কোনও মানুষকে মরতে কে কবে দেখেছে? সন্তুর মনে হল, সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু অজ্ঞান হলে চলবে না। তাকে পালাতে হবে।

বুড়ো লোকটি আবার কিছু একটা হুকুম দিতেই জারোয়ারা আর-একজন সাহেবকে চ্যাংদোলা করে তুলল। এবার সব কটা সাহেব একসঙ্গে চিৎকার শুরু করে দিল। সেটা চিৎকার না। কান্না ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু জারোয়ারা কিছুই গ্রাহ্য করল না। তারা তাকে নিয়ে গেল আগুনের কাছে।

সাহেবটি সেই বুড়ো লোকটিকে কেঁদে কেঁদে বলল, ইউ, ইউ আর নট আ রায়া-ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ? প্লিজ ফরগিভ মী, স্পেয়ার মাই লাইফ, প্লীজ...

বুড়ো লোকটি কিছুই বলল না। চিক করে মাটিতে থুতু ফেলল, তারপর আগুনের দিকে আঙুল দেখিয়ে জারোয়াদের দিকে তাকাল।

জারোয়ারা দ্বিতীয় সাহেবটিকেও আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্য যেই উঁচু করে তুলেছে, অমনি দাঁড়াম করে একটা গুলির শব্দ হল। জঙ্গলের মধ্য থেকে একটা গুলি ছুটে এসে লাগল একজন জারোয়ার হাতে। সবাই সেদিকে ফিরে তাকাল।

দূর থেকে স্তম্ভিত হয়ে সন্তু দেখল রিভলভার হাতে নিয়ে জঙ্গলের মধ্য থেকে কাকাবাবু সেই ফাঁকা জায়গাটায় চলে এলেন। এক হাতে ক্রাচ নিয়ে তিনি লাফিয়ে-লাফিয়ে হাঁটছেন। তাঁর রিভলভারটা সোজা সেই বুড়ো লোকটির বুকের দিকে তাক করা।

৯. দাশগুপ্তর মনটা ভাল নেই

দাশগুপ্তর মনটা আজ একদম ভাল নেই। পুলিশের এস পি সাহেবের কাছ থেকে ফেরার পথে সে বারবার চমকে-চমকে উঠছে। সন্ধে হয়ে গেছে, এতক্ষণে সন্তু আর মিঃ রায়চৌধুরীর কী অবস্থা হয়েছে কে জানে! জারোয়ারা কি ওদের এখনও দেখতে পায়নি? জারোয়ারা কারুকে ছাড়ে না, দেখামাত্র বিষাক্ত তীর মারে। ইস, শুধু শুধু ওঁদের প্রাণ যাবে! মিঃ রায়চৌধুরী যে কোনও কথাই শুনলেন না। জোর করে নেমে গেলেন। ঐ দ্বীপে। নিজে থেকে কেউ ওখানে যায়? ভদ্রলোকের একটা পা খোঁড়া, তবু এত সাহস। আর সন্তু তো বাচ্চা ছেলে, সে-ও কাকাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে মরবে। কাল সকালেই হয়তো দেখা যাবে, ওদের লাশ সমুদ্রের জলে ভাসছে।

আর এস পি সাহেবও যা গোঁয়ার। কিছুতেই ওঁদের উদ্ধার করতে যেতে রাজি হলেন না। দিল্লি থেকে হুকুম না পেলে তিনি যাবেন না। দিল্লি থেকে হুকুম আসতে অন্তত দু-তিন দিন লেগে যাবে, তারপর আর ওদের মৃতদেহও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দাশগুপ্ত হাঁটতে হাঁটতে এসে টুরিস্ট হোমের খাবার ঘরের একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, কে আছ, এক কাপ চা দেবে?

সেখানকার বেয়ারা কড়াকড়ি এসে বলল, হাঁ বাবু, চা দিচ্ছি। আর কী খবেন?

দাশগুপ্ত বলল, আর কী খাব! তোমার মাথা খাব!

কড়াকড়ি হাসতে হাসতে নিজের মাথায় হাত ঝুলিয়ে বলল, এটা খেতে পারবেন না বাবু, বড় শক্ত

দাশগুপ্ত রেগে উঠে বলল, ইয়ার্কি করতে হবে না, চা নিয়ে এসো শিগগির।

সেই বাবুরা কোথায় গেল?

কে জানে! সে বাবুরা আর ফিরবেন না।

অ্যাঁ? সে কী কথা? ওঁদের মালপত্র রয়েছে যে! সেই খোকাবাবু আর সেই বুড়োবাবু, তাঁরা আর ফিরবেন না? তাঁদের কী হয়েছে?

তাঁদের জারোয়ারা ধরে নিয়ে গেছে।

একথা শুনে কড়াকড়ি একেবারে হাউমাউ করে উঠল। মাথা চাপড়ে বলতে লাগল, কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ।

কড়াকড়ির কান্না শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল আরও দু-তিনজন লোক। তারা অবাক হয়ে গেছে। যখন তারাও শুনল যে, সন্তু আর কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে জারোয়ারা, খুব দুঃখ হল তাদের। জারোয়ার হাতে পড়লে যে আর কেউ বাঁচে না, তা ওরা সবাই জানে। ওরা দাশগুপ্তকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনতে লাগল।

এমন সময় আকাশে একটা শব্দ উঠল। দাশগুপ্ত চমকে উঠে বলল, কী ব্যাপার? এখন কিসের শব্দ?

কড়াকড়ি বলল, একটা এরোপ্লেন আসছে বাবু!

দাশগুপ্ত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলল, প্লেন, এই সময়? কিসের প্লেন? সন্ধের পর কখনও এখানে প্লেন আসে?

সকলেই তখন ভাবল, সত্যিই তো, পোর্ট ব্লেয়ারে তো প্লেন আসে দুপুরে। কোনওদিন তো সন্ধের পর এখানে কোনও প্লেন আসেনি। তাহলে এটা কিসের প্লেন?

প্লেনটা আকাশে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। তার মানে, এখানেই নামবে।

দাশগুপ্ত হাত পা ছুঁড়ে বলল, ট্যাক্সি! আমার এক্ষুনি একটা ট্যাক্সি চাই। ফোন করো ট্যাক্সির জন্য। না, না, ফোন করতে হবে না, দেরি হয়ে যাবে। আমি নিজেই যাচ্ছি।

দাশগুপ্ত টুরিস্ট হোমের বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোজা রাস্তা দিয়ে দৌড়তে লাগল। খানিকটা বাদেই রাস্তায় একটা ট্যাক্সি আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাঝরাস্তায়। সেই ট্যাক্সিতে দুজন লোক ছিল। দাশগুপ্ত হাত জোড় করে বলল, আমার বিশেষ দরকার, আমাকে এক্ষুনি একবার এয়ারপোর্ট যেতে হবে। যেতেই হবে! আপনারা দয়া করে নেমে পড়বেন?

দাশগুপ্তর রকম-সকম দেখে মনে হল, সে পাগল হয়ে গেছে। লোক দুটি হতভম্ব হয়ে নেমে গেল। দাশগুপ্ত ট্যাক্সিতে উঠে বসেই বলল, জলদি চালাও, এয়ারপোর্ট। জলদি

দাশগুপ্ত যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছল, তার আগেই প্লেনটা নেমে গেছে। এয়ারপোর্টে অনেক পুলিশ, স্বয়ং এস পি সাহেবও উপস্থিত। নিশ্চয়ই হোমরা-চোমরা কেউ এসেছে।

দাশগুপ্ত একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করল, কে এসেছেন? কে উনি?

পুলিশটি বলল, হোম সেক্রেটারি সাহেব এসেছেন!

দাশগুপ্ত আনন্দে একেবারে নেচে উঠল। এত বড় সৌভাগ্যের কথা ভাবাই যায় না। এস পি সাহেব এই হোম সেক্রেটারির কাছ থেকেই অনুমতি আনার কথা বলেছিলেন। সেই হোম সেক্রেটারি নিজেই দিল্লি থেকে এখানে এসে উপস্থিত! কোনও গুরুতর ব্যাপার তাহলে আছেই।

হোম সেক্রেটারি একজন বেশ লম্বা মতন লোক। মাঝারি বয়েস। মাথার চুলগুলো বড়-বড়। তিনি বড়-বড় পা ফেলে গিয়ে একটা গাড়িতে উঠলেন। দাশগুপ্ত সেদিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করতেই কয়েকজন পুলিশ তাকে বাধা দিল।

দাশগুপ্ত তখন চেঁচিয়ে এসপি সাহেবকে লক্ষ্য করে বলল, স্যার, ওঁর সঙ্গে আমার এক্ষুনি কথা বলা দরকার। সেই ব্যাপারটা...

এস পি মিঃ সিং বললেন, দাঁড়ান, ওঁকে একটু বিশ্রাম করতে দিন। উনি অতদূর থেকে সবে এসে পৌঁছেছেন–

দাশগুপ্ত বলল, একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না। এখন। আপনি বুঝতে পারছেন না।

কিন্তু ততক্ষণে হোম সেক্রেটারির গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। দাশগুপ্ত চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে সেদিকে ছুটে গিয়েও গাড়িটা থামাতে পারল না।

রাগে-দুঃখে দাশগুপ্তর চোখে জল এসে গেল। এবার আর সে এস পি সাহেবকে ভয় পেল না। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলল, আপনাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। দিল্লি থেকে আমার ওপর অর্ডার দেওয়া আছে, মিঃ রায়চৌধুরীর যাতে কোনও রকম বিপদ না হয়, তার ব্যবস্থা করার। কিন্তু আপনি আমাকে কোনও সাহায্য করেননি। একথা আমি হোম সেক্রেটারিকে বলব!

মিঃ সিং বললেন, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? হোম সেক্রেটারি যখন এসেই গেছেন, তখন ওঁর কাছ থেকে অনুমতি পেলেই আমি আপনাকে সাহায্য করব।

দাশগুপ্ত বলল, কিন্তু প্রতিটি মিনিট নষ্ট করা মানেই সাঙ্ঘাতিক ভুল করা।

দিল্লি থেকে খুব হোমরা-চোমরা কেউ এলে ওঠেন। এখানকার সরকারি অতিথি-ভবনে। দাশগুপ্ত তা জানে। ট্যাক্সিটা রাখাই ছিল, সেটা নিয়ে সে আবার সেইদিকে ছুটিল।

অতিথি-ভবনে দাশগুপ্ত আর এস পি মিঃ সিং পৌঁছল প্রায় একই সময়ে। এস পি সাহেব গাঁটগট করে ঢুকে গেলেন ভেতরে। গেটের পুলিশ দাশগুপ্তকে আটকাতে যেতেই সে পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে বলল, এটা হোম সেক্রেটারিকে দাও, তাহলেই তিনি বুঝবেন।

হোম-সেক্রেটারির নাম কৌশিক ভার্মা। তিনি তখন ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে এক কাপ চা খাচ্ছিলেন। আর এস পি সাহেবকে বলছিলেন, শুনুন, আমি এখানে এসেছি। একটা বিশেষ কাজে। আমি গোপন রিপোর্ট পেয়েছি, কিছু বিদেশি গুপ্তচর আন্দামানে নিয়মিত যাতায়াত করছে। তারা কলকাতা আর দিল্লি থেকে কিছু-কিছু পাসপোর্ট চুরি করে ভারতীয় সেজে প্লেনে করে চলে আসছে আন্দামানে। কী তাদের উদ্দেশ্য, সেটা আমাদের জানা দরকার। আন্দামানের মতন একটা সাধারণ জায়গায় বিদেশিদের নজর পড়ল কেন?

এস পি মিঃ সিং বললেন, না স্যার, এখানে তো কোনও বিদেশি আসেনি অনেকদিন। বিদেশি কোনও টুরিস্ট এলে আমার অনুমতি ছাড়া তো এখানে ঢুকতেই পারবে না।

মিঃ ভার্মা বললেন, তারা কি আর টুরিস্ট সেজে আসবে? তারা ভারতীয় সেজে গোপনে ঢুকবে।

মিঃ সিং বললেন, না স্যার, বিদেশি এলে আমার নজরে পড়তই।

এই সময় দাশগুপ্ত সেখানে ঢুকে পড়ে বলল, স্যার, আমি সেই বিদেশিদের কথা জানি।

এস পি অমনি ভুরু কোঁচকালেন। মিঃ ভার্মা মুখ তুলে দাশগুপ্তকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে?

দাশগুপ্ত বলল, স্যার, আমি আপনার ডিপার্টমেন্টেই কাজ করি। দু-বছর ধরে আন্দামানে আছি। আমার কাজ হল এখানকার অবস্থার ওপর লক্ষ রাখা। বিদেশি গুপ্তচরদের কথা প্রথমে আমিও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু মিঃ রায়চৌধুরী আমার চোখের সামনে প্রমাণ করে দিয়েছেন-

মিঃ ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, রায়চৌধুরী? কোন রায়চৌধুরী?

দাশগুপ্ত বলল, সেই যে মিঃ রায়চৌধুরী, যিনি আগে ভারত সরকারের কাজ করতেন, এখন রিটায়ার্ড, নানান জায়গায় রহস্যের সন্ধান করে বেড়ান–

কৌশিক ভার্মা চমকে উঠে বললেন, ও সেই ওয়ান-লেগেড ম্যান? সেই দারুণ সাহসী মানুষটি? কোথায় তিনি? তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

দাশগুপ্ত বলল, স্যার, তাঁর সাঙ্ঘাতিক বিপদ। এতক্ষণ তিনি বেঁচে আছেন কি না সন্দেহ।

কৌশিক ভার্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, সে কী কথা? কেন, তাঁর কী হয়েছে?

তিনি জারোয়াদের হাতে ধরা পড়েছেন।

হোয়াট? জারোয়াদের হাতে? কীভাবে ধরা পড়লেন? আপনারা কিছু করতে পারেননি?

দাশগুপ্ত হাতজোড় করে বলল, স্যার, আমি স্বীকার করছি, আমার কিছুটা দোষ আছে। আমি ওঁর সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু উনি আমার দিকে রিভলভার তুলে ভয় দেখিয়ে মিডল আন্দামানের একটা দ্বীপে নেমে গেলেন জোর করে। তারপর আমি রেসকিউ পার্টি পাঠাবার জন্য পুলিশের এস পি সাহেবকে অনুরোধ করেছিলাম। উনি রাজি হননি।

কৌশিক ভার্মা এস পি সাহেবের দিকে তাকালেন। এস পি সাহেব তখন গোঁপে তা দিচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি গোপ থেকে হাত নামিয়ে বললেন, আমি ঠিক কাজই করেছি। আমি সব ঘটনা জানিয়ে দিল্লিতে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। একটু আগে।

কৌশিক ভার্মা বললেন, দিল্লি থেকে হুকুম আসতে যদি দু-তিনদিন লাগে, ততদিন আপনি ওরকম একটা লোককে জারোয়াদের হাতে ছেড়ে রাখবেন?

মিঃ সিং বললেন, স্যার, তাছাড়া আমি কী করব বলুন? সেখানে পুলিশ পাঠালে জারোয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে যেত। গুলি খেয়ে বেশ কিছু জারোয়া মরত। একজন

জারোয়াকেও মারার হুকুম নেই। আমার কাছে। তাছাড়া সেই মিঃ রায়চৌধুরীকে আর বাঁচানো যাবে কি না সন্দেহ। কেউ বাঁচে না ঐ অবস্থায়।

কৌশিক ভার্মা উঠে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে বললেন, তা বলে কোনও চেষ্টাও করবেন না? মিঃ রায়চৌধুরী কে জানেন? ওরকম সাহসী লোক সাহেবদের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে কজন আছেন? ওরকম একজন মানুষ আমাদের দেশের গর্ব। সেই লোককে আমরা বাঁচাবার চেষ্টা করব না? ছিছিছি। এক্ষুনি রেসকিউ পার্টি পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমি নিজে তাদের সঙ্গে যাব।

এস পি সাহেব আস্তে আস্তে বললেন, এই রাত্তিরবেলা? সে তো প্রায় অসম্ভব।

কেন, অসম্ভব কেন?

মোটরবোট নিয়ে অতদূর যেতে অন্তত চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে-বনের মধ্যে ঘুটফুটে অন্ধকার, সেখানে এখন যে নামবে তাকেই প্রাণ দিতে হবে। জারোয়ারা চব্বিশ ঘণ্টা লুকিয়ে থেকে পাহারা দেয়।

কৌশিক ভার্মা বললেন, মোটরবোটের সঙ্গে সার্চ-লাইট লাগানো যেতে পারে না? সার্চ-লাইটের আলোয় অনেক দূর দেখা যাবে।

স্যার, আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, সার্চলাইটের আলোয় আর কতদূর দেখা যেতে পারে। দ্বীপটা অনেক বড়। তাছাড়া জারোয়ারা যুদ্ধ না করে পিছু হটবে না। তাতে দুপক্ষের অনেক লোক মরবে। এটা আমাদের নীতি নয়।

কৌশিক ভার্মা চিবুকে হাত রেখে চিন্তা করতে লাগলেন।

দাশগুপ্ত আস্তে আস্তোবলল, স্যার, আমি একটা কথা বলতে পারি?

বলুন।

একটা উপায়ে এক্ষুনি সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায়। বোটে না গিয়ে আমরা যদি হেলিকপটারে যাই, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায়। হেলিকপটারের ওপর থেকে আলো ফেলে খুঁজে দেখা যায় সারা জঙ্গলটা। তাতে যুদ্ধও হবে না। জারোয়ারা হেলিকপটারে তীর মারতেও পারবে না। ওদের তীর বেশি উঁচুতে পৌঁছয় না।

কৌশিক ভার্মা টেবিলে এক চাপড় মেরে বললেন, ঠিক! খুব ভাল কথা। সেই ব্যবস্থাই করা যাক।

দাশগুপ্ত বলল, সেই সঙ্গে প্রীতম সিংকেও নিয়ে গেলে ভাল হয়।

প্রীতম সিং কে?

প্রীতম সিং আগে এখানেই পুলিশের কাজ করতেন। উনি জারোয়াদের ভাষা জানেন। হেলিকপটার থেকে উনি মাইকে জারোয়াদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। মিঃ রায়চৌধুরীকে যদি ওরা মেরে না ফেলে বন্দী করে রাখে, তাহলে প্রীতম সিং-এর কথায় হয়তো ছেড়ে দেবে। প্রীতম সিং ছাড়া আর তো কেউ জারোয়াদের সঙ্গে কথাই বলতে পারবে না।

কৌশিক ভার্মা অবাক হয়ে বললেন, সেরকম লোকও আছে? তবু আপনারা কিছু চেষ্টা করেননি।

মিঃ সিং গম্ভীরভাবে বললেন, হ্যাঁ, প্রীতম সিংকে ডেকে আমি তার মত নিয়েছিলাম। প্রীতম সিং-এর মতে এখন আর চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। প্রীতম সিংকে জারোয়ারা বনের ভেতরে ঢুকতে দেয় না।

প্রীতম সিং হেলিকপটার থেকে ওদের সঙ্গে কথা বলে আসল খবরটা অন্তত জেনে নিতে পারবে। হেলিকপটার কোথায় আছে? চলুন!

আমাদের হেলিকপটার নেই। দাশগুপ্ত আবার বলল, এখানে নেভির হেলিকপটার আছে, স্যার। আমরা বললে দেবে না। কিন্তু আপনি অর্ডার দিলে ঠিকই দেবে।

আমি এক্ষুনি অর্ডার লিখে দিচ্ছি।

কৌশিক ভার্ম তাঁর সেক্রেটারিকে ডেকে তক্ষুনি অর্ডার লিখিয়ে দিলেন। তারপর এস পি-কে বললেন, একজন লোক দিয়ে এই চিঠি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন। তাকে জেনে আসতে বলুন আধঘণ্টার মধ্যে হেলিকপটার পাওয়া যাবে কি না!

একজন লোক চিঠি নিয়ে তক্ষুনি ছুটে গেল। কিন্তু একটু বাদেই সে ফিরে এল খারাপ খবর নিয়ে।

নেভির দুটি মাত্র হেলিকপটার। একটা চলে গেছে নিকোবর, সেটা তিন-চারদিনের মধ্যে ফিরিবে না। আর-একটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। সেটা সারাবার চেষ্টা চলছে।

কৌশিক ভার্মা চেঁচিয়ে উঠলেন, সেটা সারিয়ে তুলতেই হবে.যত তাড়াতাড়ি সম্ভব-আধা ঘণ্টা, অন্তত এক ঘণ্টার মধ্যে-

দাশগুপ্তর মুখটা শুকিয়ে গেছে। এত চেষ্টা করেও শেষরক্ষা করা গেল না? হেলিকপটারটাও এই সময় খারাপ!

কৌশিক ভার্মা দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, চলুন, আমি নিজে সেই হেলিকপটারটা দেখে আসতে চাই...

১০. গুণদা তালুকদার

এদিকে তখন বনের মধ্যে কী হচ্ছে?

হঠাৎ গুলির শব্দ। তারপরেই কাকাবাবু একটামাত্র ক্রাচ নিয়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে চলে এলেন সেই আগুনের কাছে। তাঁর রিভলভার সোজা সেই বুড়ো রাজার বুকের দিকে তাক করা।

জারোয়ারা প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। তারপর কাকাবাবুকে দেখে সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

কাকাবাবু বুড়ো রাজাকে আবার ইংরেজিতে বললেন, আপনার লোকদের বলুন, কেউ যেন আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা না করে! কেউ আমার কাছে এলেই আমি তার আগে আপনাকে গুলি করে মেরে ফেলব।

বুড়ো রাজা কিন্তু একটুও ভয় পাননি। তার পাকা ভুরুর নীচে চোখ দুটি ঘোলাটে। একদৃষ্টি তিনি কাকাবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর দুটো হাত তুললেন মাথার ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে জারোয়ারা থেমে গেল।

বুড়ো রাজা কাকাবাবুকে স্পষ্ট ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? কাকাবাবু বললেন, তার আগে বলুন, আপনি কে? আপনি জারোয়া নন, তা বুঝতেই পারা যায়। আপনি সভ্য মানুষ। আপনি কেন সাহেবগুলোকে পুড়িয়ে মারছেন?

বুড়ো রাজা মাটিতে চিক করে থুতু ফেললেন। তারপর হাসলেন। সেই রকম একদৃষ্টিতে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তুমি আমাকে গুলি করলেও নিজে বাঁচতে পারবে না। তোমাকে এরা শেষ করে ফেলবে। তুমি এখানে কেন এসেছ?

কাকাবাবু ডান দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, এই আগুনটা দেখতে। এই সাহেবগুলোও সেইজন্যেই এসেছে।

বুড়ো রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ওদের সঙ্গে এসেছ?

কাকাবাবু বললেন, না। কিন্তু আপনি এই অসভ্যদের সঙ্গে থেকে কি অসভ্য হয়ে গেছেন? জ্যান্ত মানুষদের পুড়িয়ে মারছেন?

বুড়ো রাজা বললেন, তোমাকে কে বলেছে, এই জারোয়ারা অসভ্য? আর এই সাহেবরা কিংবা তোমরা সভ্য? তোমাদের আমি ঘৃণা করি!

এদের ছেড়ে দিন!

এবার বুড়ো রাজা বুকে ঝুঁকে এগিয়ে আসতে লাগলেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবুর হাত কাঁপছে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, খবর্দার, আমার কাছে আসবেন না, আমি গুলি করব, ঠিক গুলি করব!

বুড়ো রাজা কোনও কথা না বলে হাসিমুখে তবু এগিয়ে আসতে লাগলেন।

কাকাবাবু বললেন, আমি গুলি করব কিন্তু! আমার রিভলভার কেড়ে নেবার চেষ্টা করবেন না, তার আগেই আমি গুলি করব।

বুড়ো রাজা একেবারে কাকাবাবুর মুখের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর কাকাবাবুর চোখের দিকে চেয়ে থেকে বাংলায় বললেন, তোমরা এই আগুনটা দেখতে এসেছ? এই আগুনটা বুঝি এত দামি? ঠিক আছে, তোমাদের সবাইকে আমি এই আগুনের মধ্যে পাঠিয়ে দেব।

দূরে, গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সন্তু শুনতে পেল, বুড়ো রাজা স্পষ্ট বাংলায় কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এই আগুনটা দেখতে এসেছ?

সন্তু তার নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না।

কাকাবাবু দারুণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বাঙালি?

বুড়ো রাজা সে-কথার উত্তর না দিয়ে কাকাবাবুর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিতে গেলেন।

কাকাবাবু বললেন, খবদার, আর এগোবেন না, আমি গুলি করব! ঠিক গুলি করব।

বুড়ো রাজা মাথার ওপর দুহাত তুলে বললেন, করো গুলি করো, দেখি তোমার কত সাহস?

কাকাবাবু গুলি করতে পারলেন না। তাঁর হাত কাঁপছে। তিনি বললেন, আমি আপনাকে মারতে চাই না। আমি জানতে চাই, আপনি কে?

বুড়ো রাজা কাকাবাবুর ডান হাতে জোরে একটা ধাক্কা মারতেই রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেল একটু দূরে। কাকাবাবু আবার সেটা কুড়িয়ে নেবার জন্য ঝুঁকতেই পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে। কাকাবাবুর যে একটা পা নেই, সেটা তাঁর মনে থাকে না। সব সময়। কাকাবাবু পড়ে যেতেই বুড়ো রাজা তাঁর পিঠের ওপর একটা পা রেখে দাঁড়ালেন।

সমস্ত জারোয়ারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। তারা দেখল তাদের বুড়ো রাজা রিভলভারকেও ভয় পান না। কাকাবাবু জোর করে ওঠবার চেষ্টা করতে যেতেই দুজন জারোয়া ছুটে এসে তাঁকে চেপে ধরল।

হাত-পা বাঁধা সাহেবগুলোও ভয়ের শব্দ করে উঠল।

দূরে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে সন্তু সব দেখল। তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এবার ওরা কাকাবাবুকে মেরে ফেলবে? সন্তু একা কী করে তাঁকে বাঁচাবে? এখনও সন্তুকে কেউ দেখতে পায়নি।

বুড়ো রাজা চিক করে মাটিতে থুতু ফেললেন। তারপর খুব কড়া গলায় কাকাবাবুকে বললেন, তোমাদের সবকটাকে আমি এক্ষুনি যমের বাড়ি পাঠাব! আমরা জারোয়ারা এখানে জঙ্গলের মধ্যে আপন মনে থাকি। আমরা কারুর কোনও ক্ষতি করি না। তোমরা কেন আমাদের বিরক্ত করতে আসো?

কাকাবাবু বললেন, আপনি জারোয়া নন। আপনি কে?

বুড়ো রাজা বললেন, আমি এক সময় বাঙালি ছিলাম। এখন আমি এদেরই একজন। আমি আর তোমাদের মতন পরাধীন নই। আমি স্বাধীন।

কাকাবাবু বললেন, আমার কষ্ট হচ্ছে, আমাকে উঠে দাঁড়াতে দিন।

বুড়ে রাজা বললেন, তোমার সব কষ্ট এক্ষুনি শেষ কবে দেব। তোমরা এই আগুনটা দেখতে এসেছিলে না? এই আগুনের মধ্যেই তোমরা যাবে। যত সব চোরের দল!

কাকাবাবু বললেন, আমি কিছু চুরি করতে আসিনি। আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম।

মিথ্যে কথা! যে-পাথরটা থেকে এই আগুন বেরুচ্ছে, তোমরা আসো সেই পাথরটা চুরি করতে। এর আগেও কয়েকটা সাহেব এসেছিল, সব কটাকে আমি যমের বাড়ি পাঠিয়েছি। তুমি বাঙালি হয়েও এই সাহেবদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছি। সাহেবের পা-চাটা! পরাধীন দেশের মানুষেরাই এরকম কাপুরুষ হয়ে যায়!

আমি ওদের সঙ্গে আসিনি। আমি ওদের পথ দেখিয়ে আনিনি।

চুপ। মিথ্যুক! কুকুর!

বুড়ো রাজা কাকাবাবুকে আর কোনও কথা বলতে দিলেন না। জারোয়াদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা কাকাবাবুকে টেনে তুলল। এবার বুঝি আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবে!

সন্তু আর থাকতে পারল না। তার যা হয় হোক। কাকাবাবু যদি মরে যান, তাহলে সে-ও মরবে!

সে কাকাবাবু বলে চিৎকার করে তীরের মতন ছুটে এল। কোনও জারোয়া তাকে ধরতে পারল না, তার আগেই সে দৌড়ে কাকাবাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সন্তুকে দেখে কাকাবাবুও খুব অবাক হয়ে গেছেন। আস্তে আস্তে বললেন, তুই চলে যাসনি? তোকে যে আমি বললাম।

বুড়ে রাজা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এই ছেলেটি কে?

কাকাবাবু বললেন, এ আমার ভাইপো। আপনি আমাকে মারতে চান মারুন, কিন্তু ওকে ছেড়ে দিন।

এইটুকু ছেলেকেও সাহেবদের চাকরের কাজে লাগিয়েছ?

সন্তু বলল, বিশ্বাস করুন, আমরা ঐ সাহেবদের সঙ্গে আসিনি। আমরা আলাদা এসেছি। ঐ সাহেবরা আমাদেরও মেরে ফেলতে চেয়েছিল।

বুড়ো রাজা সন্তুকে বললেন, আমার কাছে এসো!

বুড়ো রাজার চোখের দিকে তাকালেই ভয় করে। তবু সন্তু এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল। বুড়ো রাজা একটা হাত বাড়িয়ে সন্তুর গালটা ছুঁলেন।

রাজার গায়ের সব চামড়া কুঁচকে গেছে। লম্বা লম্বা শুকনো আঙুলের ছোঁয়ায় সন্তুর গাটা একবার শিরশির করে উঠল।

রাজা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর মুখে একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব ফুটে উঠল। তিনি আপনমনে বললেন, আমার ঠিক এই বয়েসী একটা ভাই ছিল। জানি না। সে এখনও বেঁচে আছে কি না।

তারপর তিনি মুখ নামিয়ে সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

সুনন্দ রায়চৌধুরী। আমার কাকাবাবু একজন খুব পণ্ডিত লোক। উনি মোটেই চোর নন।

অনেক পণ্ডিতও চোর হয়। টাকা-পয়সার লোভে তারাও সাহেবদের পা চাটে।

আমার কাকাবাবু মোটেই সেরকম লোক নন। তাহলে সাহেবদের বাঁচাবার জন্য ওর এত দরদ কেন?

এবার কাকাবাবু বললেন, কোনও মানুষকেই মেরে ফেলা আমি পছন্দ করি না। এই সাহেবদের অন্য শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, মেরে ফেলা উচিত নয়।

ওরা আমার অন্তত পনেরোজন জারোয়াকে মেরে ফেলেছে। কেন? জারোয়ারা ওদের কোনও ক্ষতি করেছিলা? জারোয়ারা এখানে শান্তভাবে থাকে-তারা তো অন্য কোনও জায়গায় গিয়ে অন্যদের মারতে যায় না।

সাহেবরা অন্যায় করেছে ঠিকই। সেজন্য তাদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। আপনি সভ্যজগতের মানুষ।

চুপ! তোমাদের সভ্যতাকে আমি ঘৃণা করি!

কাকাবাবুকে তখনও দুজন জারোয়া চেপে ধরে আছে। আগুনটা এখান থেকে খুব কাছে। গায়ে আঁচ লাগছে। কিন্তু ঐ আগুনের কতরকম রঙ। দেখতে খুব সুন্দর লাগে।

হঠাৎ বিরবির করে বৃষ্টি নামল। এরকমভাবে যখন-তখনই বৃষ্টি নামে এখানে। সন্তু ভাবল, বৃষ্টিতে কি আগুনটা নিভে যাবে? কিন্তু সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখল। বৃষ্টির জল, সেই

আগুনের মধ্যে পড়তেই পারছে না। ছাঁত ছাতি শব্দে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছোট ছোট আগুনের ফুলকি হয়ে যাচ্ছে। যেন সেই আগুনের শিখার ওপর অসংখ্য জোনাকি। এরকম দৃশ্য সন্তু কখনও দেখেনি।

কাকাবাবু বিড়বিড় করে বললেন, এটা পৃথিবীর আগুন হতেই পারে না। এই আগুন অন্য কোনও জায়গা থেকে এসেছে।

বুড়ো রাজা বললেন, এই আগুন জ্বলছে বহু বছর ধরে। কখনও নিভবে না।

বৃষ্টি আরও জোরে এল। বুড়ো রাজা জারোয়াদের কিছু একটা হুকুম করে পেছন ফিরে চলতে লাগলেন। জারোয়ারা সন্তু আর কাকাবাবুকে ধরে রেখে তাঁর সঙ্গে চলল। রাজা একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, জারোয়ারা সন্তু আর কাকাবাবুকে তার মধ্যে ঠেলে দিল।

ঘরটার মধ্যে প্রায় কিছুই জিনিসপত্র নেই। মাটিতে ছড়ানো রয়েছে একগাদা শুকনো পাতা, তার ওপর দুটো হরিণের শুকনো চামড়া। একটা আস্ত গাছ উঠে গেছে। ঘরের এক কোণ দিয়ে। সেই গাছের ডালে একটা বাঁশের চোঙা ঝোলানো। তাতে জল ভর্তি। বুড়ো রাজা সেটা নিয়ে ঢাক ঢক করে জল খেলেন খানিকটা। তারপর কাকাবাবুদের বললেন, বসো।

বসবার পর আর দুটো জিনিসের দিকে চোখ পড়ল ওদের। ঘরের এক পাশে এক টুকরো লাল কাপড়ের ওপর রাখা আছে একটা বই। বইটার মলাটের ওপর লেখা আছে গীতা। আর তার পাশে একটা লোহার হাতকড়া। পুলিশরা চোর ডাকাতের হাতে যে-রকম হাতকড়া পরিয়ে দেয়।

ওরা দুজনেই সেই দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বুড়ো রাজা বললেন, ঐ দুটো আমার পুরনো কালের স্মৃতি। আর কিছুই নেই। কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বয়েস

কত? বুড়ো রাজা বললেন, হিসেব রাখি না। কী দরকার বয়েসের হিসেবে? আশি-নব্বই হতে পারে, একশোও হতে পারে। জানি না। কতদিন আগে এসেছি।

কাকাবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, আমি বোধহয় আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনার নাম কি গুণদা তালুকদার?

কী বললে?

আপনি নিশ্চয়ই গুণদা তালুকদার?

কে গুণদা তালুকদার? তুমি তার কথা কী করে জানলে?

আমি আন্দামানে আসবার আগে, এখানকার সম্পর্কে যত কিছু বইপত্র আছে, তা সব পড়ে ফেলেছি। বহু বছর আগে আন্দামান জেল থেকে গুণদা তালুকদার নামে একজন বিপ্লবী পালিয়েছিলেন। ঐ জেল থেকে মাত্র ঐ একজনই পালিয়েছেন। কিন্তু ধরা পড়েননি। সবাই তখন ভেবেছিল, গুণদা তালুকদার সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন। আজ এই হাতকড়াটা দেখেই হঠাৎ মনে হল...

বুড়ো রাজা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, এসব কথা বইতে লেখা আছে? গুণদা তালুকদারকে এখনও লোকে মনে রেখেছে?

কাকাবাবু বললেন, নিশ্চয়ই! আপনার ছবি ছাপা হয়েছে কত বইতে। অবশ্য সে-ছবি দেখে এখন আপনাকে চেনা যায় না। আপনার জন্মদিনে উৎসব হয় অনেক জায়গায়। নেতাজীকে যেমন খুঁজে পাওয়া যায়নি, তেমনি আপনাকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। দেশের লোক আপনাকে শ্রদ্ধা করে।

নেতাজী কে?

সে কী, আপনি নেতাজীর নাম শোনেননি? সুভাষচন্দ্র বসু, আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে যিনি যুদ্ধ করেছিলেন ব্রিটিশের সঙ্গে?

সুভাষবাবু? তিনি যুদ্ধ করেছেন? কবে?

আপনি এসব কিছুই জানেন না? না। আমার নাম লোকে মনে রেখেছে? তার মানে পুলিশ এখনও আমার খোঁজ করে?

পুলিশ? আপনাকে খুঁজবে কেন? ও সেই জন্যই আপনি আমাদের পরাধীন দেশের মানুষ বলছিলেন? আমাদের দেশ তো বহুদিন আগে স্বাধীন হয়ে গেছে। এই যে সন্তু, ও তো স্বাধীন দেশে জন্মেছে। ভারত এখন পৃথিবীর একটি প্রধান দেশ।

স্বাধীন হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। আপনি দেশের জন্য কত লড়াই করেছেন, জেল খেটেছেন, আর সেই খবরটা রাখেন না?

আমি গত পঞ্চাশ-যাট বছর ধরে বাইরের কোনও লোকের সঙ্গে কথাই বলিনি।

আপনার কথা জানতে পারলে সবাই দারুণ খুশি হবে। সারা দেশ আপনাকে নিয়ে উৎসব করবে।

আমি আর কোথাও যাব না। আমি এইখানে খুব ভাল আছি।

আপনি এখানে এলেন কী করে? জারোয়ারা আপনাকে রাজা করে নিল?

আমি একটা ছোট ভেলা নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়েছিলাম। ঝড়ে সেই ভেলা উল্টে গেল। আমি মরেই যেতম। অজ্ঞান অবস্থায় ভাসতে ভাসতে এই দ্বীপে এসে ঠেকেছিলাম। আমাকে এরা মারেনি কেন জানি না। তখনও আমার এক হাতে হাতকড়া ঝুলছিল। এরা

মোটেই হিংস্র নয়। এদের যদি কেউ বিরক্ত না করে, এরা কখনও অন্য মানুষকে মারে না। এরা আমাকে খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করে তুলেছিল। সে কতকাল আগের কথা!

কিন্তু আপনি তো এদের সভ্য করে তুলতে পারতেন!

চুপ, ও কথা বলো না! সভ্য মানে কী? তোমরা সভ্য আর এরা অসভ্য? এখানে কেউ চুরি করে না, মিথ্যে কথা বলে না। এখানে সবাই খাবার একসঙ্গে ভাগ করে খায়। এখানে কোনও রোগ নেই। এর থেকে বেশি সুখ মানুষ আর কী চায়? আমিই এদের বারণ করেছি তোমাদের মতন সভ্য লোকদের সঙ্গে মিশতে তোমরা এদের নষ্ট করে দেবে।

আপনার মতন একজন মানুষ এখানে এইভাবে লুকিয়ে আছেন, একথা আমার কাছে শুনলেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

তোমরা কেন এই জারোয়াদের ওপর অত্যাচার করতে আসো?

আমি বন্ধুত্ব করতে এসেছি।

তোমারও ঐ পাথরটার ওপর লোভ আছে নিশ্চয়ই?

কোন পাথরটা?

যেটা দিয়ে আগুন জ্বলে।

ওটার কথা আমি জানতামই না। তবে আন্দাজ করেছিলাম, এরকম একটা মহা-মূল্যবান জিনিস এখানে আছে। সাহেবরা আগেই টের পেয়েছে নিশ্চয়ই।

ওটা কী তুমি বুঝতে পেরেছ?

নিশ্চয়ই ওটা কোনও উল্কা। কিংবা অন্য কোনও গ্রহের ভাঙা টুকরো। পৃথিবীতে এরকম কিছু কিছু মাঝে-মাঝে এসে পড়ে। অনেকগুলো আসার পথেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু

এটা বহু বছর ধরে জ্বলছে। এটার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোনও ধাতু আছে, যা আমাদের পৃথিবীতে নেই। সে রকম নতুন ধাতুর আবিষ্কার হলে তার সাঙ্ঘাতিক দাম হবে। পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে যাবে।

জারোয়ারা আগুন জ্বালাতে পারে না। এই আগুন থেকেই তারা সব কাজ চালায়। সেই আগুন চুরি করতে চায় কেন সভ্য মানুষ?

তা বলে একটা নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হবে না? এর বদলে ওদের আমরা হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ দেশলাই দিতে পারি।

না, এটা প্রকৃতির দান ওরা তাই নিয়েছে। ওরা সভ্য মানুষদের কাছ থেকে কিছুই চায় না। তোমাদের আমি ছেড়ে দিতে পারি এক শর্তে, তোমরা এই আগুনের কথা কখনও কারুকে বলতে পারবে না।

কিন্তু আমরা আপনাকেও নিয়ে যেতে চাই।

আমাকে?

দেশ স্বাধীন হয়েছে, আপনি একবার দেখতে আসবেন না? একবার দিল্লিতে আর কলকাতায় চলুন। দেখবেন, কত কী বদলে গেছে।

না, আমি যাব না।

এই সময় বাইরে হঠাৎ দারুণ একটা গোলমাল শোনা গেল। ডিসুম ডিসুম করে শব্দ হল বন্দুকের গুলির।

ওরা তিনজনই চমকে উঠল।

বুড়ো রাজা উঠে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়ালেন। তারপর বাইরে একবার তাকিয়েই কাকাবাবুর দিকে মুখ ফেরালেন। আস্তে আস্তে বললেন, তোমার জন্যই এবার আমাদের সর্বনাশ হল!

সন্তুও লাফিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দরজার পাশে। সে দেখল, সেই সাহেবগুলো হাতের বাঁধন খুলে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। তিন-চারজনের হাতে বন্দুক, এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে চারদিকে।

বুড়ো রাজা বললেন, এবার ওরা সবাইকে মেরে ফেলবে।

কাকাবাবু বললেন, আপনি ঘরের মধ্যে ঢুকে আসুন। বাইরে যাবেন না।

বুড়ো রাজা বললেন, ঘরের মধ্যে ঢুকলেও বাঁচা যাবে না। ওদের কাছে লাইট মেশিনগান আছে। ওরা আমার লোকজনকে মারছে।

সত্যিই তাই। কয়েকজন জারোয়া প্রাণের ভয় না করে সাহেবদের দিকে তাড়া করে আসছিল, সাহেবরা কটু কটু কটু কটু করে গুলি চালাল, সঙ্গে সঙ্গে তারা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। জারোয়াদের বিষাক্ত তীর দুজন সাহেবের গায়ে লাগল, কিন্তু তাতে তাদের কিছুই হল না। সাহেবরা আগেই বিষ প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন নিয়ে নিয়েছে।

কাকাবাবুকে ঠেলে বুড়ো রাজা বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে। দুহাত উঁচু করে ইংরেজিতে চেঁচিয়ে বললেন, হোল্ড অন।

সঙ্গে সঙ্গে একজন সাহেব হিংস্রভাবে ঘুরে দাঁড়াল সেই দিকে। তার হাতে একটা বেঁটে আর মোটা ধরনের বন্দুক। সন্তু বুঝল, ওটারই নাম বোধহয় লাইট মেশিনগান।

সন্তুর মনে হল, সাহেবটি এক্ষুনি বুড়ো রাজাকে মেরে ফেলবে।

কিন্তু বুড়ো রাজার দারুণ সাহস। তবু তিনি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে একপা একপা করে এগিয়ে গেলেন সাহেবদের দিকে। তারপর ইংরিজিতে বললেন, তোমরা আমার লোকদের শুধু শুধু মেরো না। তোমরা যা চাও, তাই নিয়ে যাও।

তিনি জারোয়াদের দিকে তাকিয়ে কী একটা অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করলেন। অমনি তারা সার বেঁধে পেছিয়ে যেতে লাগল। সেইসঙ্গে মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। সেই শব্দটা ঠিক কান্নার মতন।

আর-একজন সাহেব এগিয়ে এসে খুব নিষ্ঠুরভাবে প্রচণ্ড এক চড় কষাল বুড়ো রাজার গালে। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে। সাহেবটা বুড়ো রাজার বুকের ওপর পা তুলে বলল, একে এক্ষুনি মেরে ফেলব! এই বুড়োটাই যত নষ্টের মূল। এর হুকুমেই আমাদের একজন বন্ধুকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এতক্ষণে আমাদেরও মেরে ফেলত।

মেশিনগান-হাতে সাহেবটি বলল, ওকে এক্ষুনি মেরো না, একটু পরে। ওর কাছ থেকে আরও কিছু খবর জানা যেতে পারে।

যে লতা দিয়ে সাহেবদের বাঁধা হয়েছিল, সেই লতা দিয়েই ওরা বেঁধে ফেলল বুড়ো রাজাকে।

সেই অবস্থাতেও বুড়ে রাজা বললেন, আমাকে মারার চেষ্টা কোরো না। তাহলে তোমরা একজনও বেঁচে ফিরতে পারবে না। এখান থেকে তোমরা যা চুরি করতে এসেছ, তাই নিয়ে ফিরে যাও!

একজন সাহেব বুড়ো রাজার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল।

সন্তু আর কাকাবাবু সেই কুঁড়ে ঘরের দরজার কাছে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। মাটিতে শুয়ে থাকলে হঠাৎ গায়ে গুলি লাগে না। বুড়ো রাজার এই দুর্দশা দেখে ওরা শিউরে উঠল।

কাকাবাবু আফশেস করে বললেন, ইস, আমার রিভলভারটা যদি এখন কাছে থাকত

সন্তু দেখল, খানিকটা দূরে মাটির ওপরে কাকাবাবুর রিভলভারটা পড়ে আছে। একজন সাহেবের পায়ের কাছে।

কিন্তু চারজন সাহেবের হাতে বন্দুক একজনের হাতে লাইট মেশিনগান, কাকাবাবু শুধু একটা রিভলভার নিয়ে কী করতেন?

একজন সাহেবের কাঁধে ঝোলানো আছে একটা ব্যাগে। সে সেটা খুলে ফেলল। তার মধ্য থেকে বেরুল অনেক কিছু। নানারকমের যন্ত্রপাতি আর একটা খুব মোটা ফিতের মতন জিনিস গোল পাকানো। সেটা খুলে ফেলতেই দেখা গেল, সেটা আসলে একটা বিরাট লম্বা ক্যাম্বিসের জলের পাইপ। তার একটা মুখ ধরে দুজন সাহেব ছুটে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

একটু বাদেই সেই পাইপটা ফুলে উঠল আর তার অন্য মুখ দিয়ে জল বেরুতে লাগল। আর দুজন সাহেব সেটা নিয়ে গেল আগুনটার দিকে। কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, ওরা ঝনা থেকে জল আনছে। সন্তুও ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, ওরা আগুন নেভাতে চাইছে কেন?

কাকাবাবু বললেন, যে পাথরটা থেকে ঐ আগুন বেরুচ্ছে, সেটার সাংঘাতিক দাম। কোটি কোটি টাকা। ওরা সেটা চুরি করতে এসেছে। ওটা নিশ্চয়ই অন্য কোনও গ্রহের টুকরো কিংবা উল্কা। হয়তো ওর মধ্যে এমন অনেক নতুন ধাতু আছে, যা পৃথিবীর মানুষ কখনও দেখেনি। ওগুলো পেলে আমাদের বিজ্ঞানের অনেক নিয়ম উল্টে যেতে পারে।

সন্তু বলল, সাহেবগুলো ঐ পাথরটা যে এখানে আছে তা জানল কী করে?

কাকাবাবু বললেন, পৃথিবীতে কোথায় কখন উল্কাপাত হয়, অনেক বৈজ্ঞানিক তার খবর রাখেন। সবগুলোরই সন্ধান পাওয়া যায়, শুধু এটারই পাওয়া যায়নি। তবে এই লোকগুলো বৈজ্ঞানিক নয়। এরা যেমন হিংস্র আর নিষ্ঠুর, তাতে মনে হয় এরা একটা ডাকাতের দল। কোনও বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে খবর পেয়ে এখানে চলে এসেছে।

সন্তু বলল, ওদের মধ্যে একজন পাঞ্জাবীও তো রয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, ঐ পাঞ্জাবীটি ওদের পথ দেখিয়ে এনেছে। নিশ্চয়ই অনেক টাকা দিয়ে হাত করেছে। ওকে।

তারপর আর ওরা কথা বলতে পারল না। অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল আগুনের দিকে।

সাহেবরা পাইপে করে আগুনের মধ্যে জল ছেটাতেই একটা আশ্চর্য সুন্দর জিনিস হল। আগুনের মধ্যে জল পড়তেই সেই জল লক্ষ লক্ষ রঙিন ফুলঝুরি হয়ে উঠে আসতে লাগল ওপরের দিকে। সমস্ত জায়গাটা লাল-নীল আলোয় শুয়ে গেল। আগুন নেভার কোনও চিহ্নই দেখা গেল না।

সাহেবরা তবু থামবে না। তারা জল ছিটিয়েই যেতে লাগল। আর সন্তু একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল সেই ফুলঝুরি। এত সুন্দর রঙের খেলা সে কখনও দেখেনি। এখন আর ভয়ের কথা, বিপদের কথা তার মনে পড়ছে না।

কাকাবাবু বললেন, ও আগুন এই পৃথিবীর নয়। পৃথিবীর জল দিয়ে ঐ আগুন নেভানো যাবে না। ঐ আগুনেই পাথরটা পুড়ে পুড়ে একদিন শেষ হয়ে যাবে।

সাহেবরা এবার একটা কৌটো থেকে মুঠো মুঠো পাউডার ছড়াতে লাগল আগুনে। তাতেও কাজ হল না কিছুই। পাউডারগুলো পড়তেই দপ করে এক-একটা শিখা বেরিয়ে আসতে লাগল।

তাতেও নিরাশ হল না। সাহেবরা। এবার একটা সরু লম্বা গাছের গুড়ির কাছে গিয়ে মেশিনগানের গুলি চালাল পঁচিশ তিরিশটা। তারপর গাছটাকে ধরে কাৎ করতেই সেটা ভেঙে গেল মড়াত করে।

ওরা চারজনে মিলে সেই গাছটাকে বয়ে এনে আগুনের মধ্যে তার একদিকটা ঢুকিয়ে দিল অনেকখানি। গুম করে একটা শব্দ হল। পাথরটার গায়ে গাছটার ধাক্কা লেগেছে।

তখন সাহেবরা উৎসাহ পেয়ে গাছটাকে আবার বার করে এনে খানিকটা পিছিয়ে এল। তারপর জোরে দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মারল আবার। আবার গুম করে শব্দ হল, আগুনের শিখাগুলো যেন নড়ে-চড়ে উঠল খানিকটা।

সন্তুরা দম বন্ধ করে দেখছে। তারা বুঝতে পেরেছে সাহেবদের মতলবটা কী! তারা গাছ দিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে আগুনের ভেতর থেকে পাথরটাকে বার করে আনতে চাইছে। কিংবা আগুনসুদ্ধই পাথরটাকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে ঝর্নার মধ্যে ফেলবে।

কিন্তু একটু পরেই আর একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হল। পাথরটা সহজে নড়ানো যায় না বলে ওরা খুব জোরে জোরে ধাক্কা মারছিল। এতবার ধাক্কা মারতে গিয়ে ঝোঁক সামলাতে না পেরে একজন সাহেব আগুনটার খুব কাছে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকের মতন আগুন তাকে টেনে নিল ভেতরে। ঠিক যেন একটা হাতের মতন একটা আগুনের শিখা বেরিয়ে টেনে নিয়ে গেল লোকটিকে। সে একটা বীভৎস চিৎকার করে উঠল, তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

শেষ মুহূর্তে সন্তু চোখ বুজে ফেলেছিল। আবার যখন চোখ মেলল, তখন দেখল, গাছটা ফেলে দিয়ে অন্য সাহেবরা ভয়ে পালিয়ে আসছে। কাকাবাবু কপালের ঘাম মুছছেন।

সাহেবটা আগুনে পুড়ে যাবার সময় দূরের জারোয়ারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগান হাতে সাহেবটি সেদিকে এক ঝাঁক গুলি চালাল।

বুড়ো রাজা হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই আবার হুকুমের সুরে চেঁচিয়ে বললেন, ওদের মেরো না! আমি হুকুম দিলে ওরা তোমাদের এখনও শেষ করে দিতে পারে!

সাহেবটা অসম্ভব রেগে গেল সেই কথা শুনে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, বুড়ো বদমাশ, এবার তোকেই আগুনে পোড়াব। এই ল্যারি, এই বুড়োটাকে তুলে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দে তো!

অন্য সাহেবরা কাছাকাছি এক জায়গায় হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজন সঙ্গী তাদের চোখের সামনে আগুনে পুড়ে গেল! ব্যাপারটা ওরাও যেন সহ্য করতে পারছে না।

মেশিনগান-হাতে সাহেবটিই বোধহয় ওদের সদর। সে কিন্তু দামেনি। সে আবার চিৎকার করে বলল, ল্যারি, এদিকে এসো, এই বুড়োটাকে আগুনে ফেলে দাও!

ওপাশ থেকে ল্যারি উত্তর দিল, জ্যাক, পাথরটা পাবার কোনও আশা নেই। ওটা খুনে আগুন। চলো, আমরা এবার পালাবার চেষ্টা করি। নইলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব।

জ্যাক বলল, পালাবার আগে প্রতিশোধ নিতে হবে। এই বুড়োটাকে আমার চোখের সামনে আগুনে পোড়াতে চাই। আমি জারোয়াদের দিকে মেশিনগান তুলে রাখছি, তুমি একে আগুনে ফেলে দাও!

ল্যারি এগিয়ে এল।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, সন্তু, আমার রিভলভারটা...

সন্তু বুকে হেঁটে আস্তে আস্তে এগোল। রিভলভারটা যেখানে পড়ে আছে, সাহেবটা সেখান থেকে খানিকটা দূরে। সন্তু মাটির ওপর দিয়ে শুয়ে শুয়ে গেলে বোধহয় ওরা তাকে দেখতে পাবে না।

এই সময় তিনবার কাক ডেকে উঠল। অর্থাৎ ভোর হয়ে আসছে। আলো ফোঁটার আর বেশি দেরি নেই। আরও কয়েকটা পাখির ডাক, আরও কী যেন শব্দ হচ্ছে দূরে।

সন্তু রিভলভারটা নিয়ে ফিরে আসার সময় পেল না। ল্যারি এসে বুড়ো রাজাকে পাঁজাকালো করে তুলে নিতেই কাকাবাবু আর থাকতে পারলেন না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাঙ্গারুর মতন লাফাতে লাফাতে ছুটে গেলেন ওদের কাছে। চিৎকার করে বললেন, থামো, থামো! ওকে মেরো না!

জ্যাক চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল কাকাবাবুকে। তারপর বলল, এই আর একটা শয়তান! ধর এটাকেও!

কাকাবাবুকে দেখে বুড়ো-রাজা শান্তভাবে বললেন, আমি কিছুতেই ইংরেজের হাতে মারব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তোমার জন্য সেই অপমানের মৃত্যুই আমাকে মরতে হচ্ছে। তুমিও মরবে!

কাকাবাবু ল্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে একজন জারোয়া আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় আমি এসে তোমাকে বাঁচিয়েছিলাম, ঠিক কি না? তুমি এই বুড়ো রাজাকে ছেড়ে দাও!

ল্যারি তাকাল জ্যাকের দিকে। জ্যাক বলল, এই দুটো বুড়োকেই আগুনের মধ্যে ফেলে দাও! নইলে আমরা পালাবার সময় এরা আমাদের পেছনে জারোয়াদের লেলিয়ে দেবে।

ল্যারি তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যাক ধমক দিয়ে বলল, দেরি করছ কী? দাও, ফেলে দাও। সঙ্গে সঙ্গে আকাশে একটা প্রচণ্ড ঘট ঘট শব্দ শোনা গেল। দূর থেকে শব্দটা এগিয়ে এল খুব কাছে। সবাই চমকে ওপরে তাকাল। একটা হেলিকপটার।

ল্যারি বলল, জ্যাক, শিগগির পালাও! হেলিকপটার নিয়ে পুলিশ এসেছে।

হেলিকপটার দেখে সন্তুরও মনে হল, নিশ্চয়ই তাদের উদ্ধার করার জন্যই ওটা এসেছে। আর কোনও চিন্তা নেই। সে উঠে সোজা হয়ে বসল।

জ্যাক দাঁতে দাঁত চেপে বলল, একটা মোটে হেলিকপটার এসেছে, তাতে ভয় পাবার কী আছে? আমি এই মেশিনগান দিয়ে ওটাকে ফুড়ে দিচ্ছি। এক্ষুনি। তোমরা সরে দাঁড়াও, কিংবা মাটিতে শুয়ে পড়ো!

কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, সন্তু–

সন্তু বুঝতে পারল না, কাকাবাবু তাকে কী করতে বলছেন। হেলিকপটারটা নীচের দিকে নেমে আসছে। আর একটু নীচে নামলেই জ্যাক গুলি চালাবে। তাদের সব আশা শেষ হয়ে যাবে।

সন্তুর খুব কাছেই পড়ে আছে কাকাবাবুর রিভলভারটা। সে সেটা চট করে তুলে নিল। কোনও চিন্তা না করেই সে দুটো গুলি চালিয়ে দিল জ্যাকের দিকে। গুলির শব্দে তার নিজেরই কানে তালা লেগে গেল, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল হাতে। সে চোখ বুজে ফেলল ভয়ে।

আবার চোখ খুলে দেখল, জ্যাক মাটিতে পড়ে গেছে, আর কাকাবাবু মেশিনগানটা তার হাত থেকে তুলে নিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর কাকাবাবু সেটা বাকি সাহেবদের দিকে ফিরিয়ে বললেন, তোমরা সব চুপ করে সারি বেঁধে দাঁড়াও। কেউ একটু নড়বার চেষ্টা করলেই গুলি চালিয়ে শেষ করে দেব-

ঘ্যাট ঘ্যাট ঘ্যাট ঘ্যাট শব্দ করে হেলিকপটারটা ঘুরতে লাগল ওদের মাথার ওপরে। একটু একটু করে নীচে নেমে আসছে। অনেকটা কাছে আসার পর সেটা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল। কে যেন মাইকে বলছে, আকিলা কিলকিল টুংকা টাকিলা! আকিলা কিলকিল টুংকা টাকিলা।

সন্তু অবাক হয়ে গেল। এ আবার কী? সেই আওয়াজ শুনে জারোয়ারা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, টাকিলা। টাকিলা?

হেলিকপটার থেকে আবার আওয়াজ ভেসে এল, কাকিনা সুপি সুপি। কাকিনা সুপি সুপি!

এবার জারোয়ারা কোনও উত্তর দিল না। সবাই বুড়ো রাজার দিকে তাকিয়ে রইল।

কাকাবাবু বুড়ো রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কী বলছে?

বুড়ো রাজা বললেন, ঐ জিনিসটা থেকে কেউ একজন জারোয়া ভাষায় বলছে, মাঝখানে জায়গা ছেড়ে দিতে। ওটা এখানে নামবে।

কাকাবাবু বললেন, সবাইকে আপনি সরে যেতে বলুন! জায়গা করে দিতে বলুন!

এবার হেলিকপটার থেকে ইংরিজিতে কেউ জিজ্ঞেস করল, মিঃ রায়চৌধুরী, আর ইউ দেয়ার? মিঃ রায়চৌধুরী, আর ইউ দেয়ার?

কাকাবাবু চিৎকার করে বললেন, ইয়েস, আই অ্যাম হিয়ার। রায়চৌধুরী স্পিকিং-

কিন্তু হেলিকপটারের ঘাটঘ্যাট আওয়াজে তাঁর কথা বোধহয় ওপরে পৌঁছল। না, কারণ, ওরা সেই কথাই বারবার বলে যেতে লাগল।

কাকাবাবু সাহেবদের দিকে মেশিনগান তুলে রেখে, চোখ না সরিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, সন্তু, তোমার পকেটে রুমাল আছে?

রিভলভার থেকে গুলি চালাবার পর সন্তু আচ্ছন্নের মতন হয়ে মাটিতেই বসে ছিল। এবার সে তাড়াতাড়ি উঠে বলল, হ্যাঁ আছে।

কাকাবাবু বললেন, সেই রুমালটা বার করে মাথার ওপরে ওড়াতে থাক।

সন্তু তার সাদা রুমালটা বার করে ডান হাতে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগল।

কাকাবাবু সাহেবদের হুকুম করলেন, তোমরা সব মাটিতে বসে পড়ো। প্রত্যেকে হাত দুটো মাথার ওপরে তুলে রাখো।

একজন সাহেব মাটিতে পড়ে থাকা একটা বন্দুকের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, কাকাবাবু বললেন, সাবধান, একটু নড়লেই খুলি উড়িয়ে দেব!

হেলিকপটারটা আস্তে-আস্তে ফাঁকা জায়গাটায় এসে নামল। প্রথমেই তার থেকে বেরিয়ে এল ধপধাপে সাদা দাড়িওয়ালা একজন শিখ। সে হাত তুলে বলল, টুংচা সংচু! টুংচা সংচু!

বুড়ো রাজা বললেন, টুংচা সংচু!

সঙ্গে-সঙ্গে সব জারোয়া সেই কথা বলে চেঁচিয়ে উঠল। বৃদ্ধ শিখটি তখন হেলিকপটারের দিকে হাত নাড়তেই তার থেকে বেরিয়ে এল আরও কয়েকজন।

প্রথমেই লম্বা চেহারার কৌশিক ভার্মা, তারপর বেঁটে গোলগাল পরেশ দাশগুপ্ত, তারপর বিশাল গোঁফওয়ালা পুলিশের এস পি মিঃ সিং আর চারজন সৈন্য, তাঁদের প্রত্যেকের হাতে মেশিনগান।

পরেশ দাশগুপ্ত ছুটে এসে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে লোফাতে-লাফাতে বললেন, মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি বেঁচে আছেন! আঃ, কী যে আনন্দ হচ্ছে! এই দেখুন, হোম সেক্রেটারি কৌশিক ভার্মা নিজে এসেছেন আপনাকে উদ্ধার করতে।

কাকাবাবুর আনন্দ হলেও মুখে তা প্রকাশ করেন না। কৌশিক ভার্মাকে দেখে তিনি বললেন, আপনার সোলজারদের বলুন, এই সাহেবগুলোকে ঘিরে ফেলতে। আমি আর এই ভারী মেশিনগানটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না!

কৌশিক ভার্মা বললেন, এরা কারা?

কাকাবাবু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, এরা ডাকাত!

কৌশিক ভার্মা অবাক হয়ে বললেন, জারোয়াদের মধ্যে ডাকাতি করতে এসেছে? কিসের লোভে? এদের কাছে কি সোনা আছে? হীরে আছে?

কাকাবাবু বললেন, না, সে সব কিছু নেই। কিন্তু এইটা আছে।

কাকাবাবু সেই রঙিন আগুনটার দিকে হাত দেখালেন। দিনের আলো ফুটে উঠেছে। এই সময় আগুনের রঙ বদলে যায়। এই আগুনটার রঙ কিন্তু একইরকম আছে।

কৌশিক ভার্মা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, আশ্চর্য! এরকম আগুন কখনও দেখিনি। সাহেবরা এটা চুরি করতে এসেছিল? এটা কী?

কাকাবাবু বললেন, সে সব পরে বলব। আপনি জারোয়াদের দ্বীপে এসেছেন, আগে এখানকার রাজাকে নমস্কার করুন! ইনিই জারোয়াদের রাজা?

হাত থেকে মেশিনগানটা ফেলে দিয়ে কাকাবাবু বুড়ো রাজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

কৌশিক ভার্মা আরও অবাক হয়ে বললেন, ইনি রাজা? মই গড! ইনি তো জারোয়া নন!

কৌশিক ভার্মা হাত জোড় করে নমস্কার করলেন বুড়ো রাজাকে। কাকাবাবু বললেন, না, ইনি জারোয়া নন। এর নাম গুণদা তালুকদার।

বুড়ো রাজা আস্তে আস্তে বললেন, সাহেবগুলোকে ভাল করে বেঁধে ফেলতে বলুন। এরা সাঙ্ঘাতিক লোক। আপনারা চলুন, আমার ঘরে বসে কথা বলা যাক।

কাকাবাবু পরেশ দাশগুপ্তর কাঁধে ভর দিয়ে বুড়ো রাজার কুঁড়েঘরের দিকে এগোলেন। বুড়ো রাজা যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর সন্তুকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন।

সন্তু কাছে যেতেই বুড়ো রাজা তার মাথায় খুব স্নেহের সঙ্গে হাত বোলাতে লাগলেন, তারপর কৌশিক ভার্মাকে বললেন, এই ছেলেটি না-থাকলে আজ আমরা কেউ বাঁচতুম না। আপনারাও বাঁচতেন না।

কৌশিক ভার্মা বললেন, তাই নাকি? কেন? এ কী করেছে?

বুড়ো রাজা বললেন, ঐ একজন সাহেবের হাতে মেশিনগান ছিল, সে গুলি চালিয়ে আপনাদের ঐ ফড়িঙের মতন যন্ত্রটায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারত।

বুড়ো রাজা আগে কখনও হেলিকপটার দেখেননি, তাই নাম জানেন না।

কৌশিক ভার্মা বললেন, তা হয়তো পারত। সাহেবগুলো মেশিনগান নিয়ে ডাকাতি করতে এসেছে, এ ভারী আশ্চর্য ব্যাপার। এই জঙ্গলের মধ্যে ডাকাতি?

বুড়ে রাজা বললেন, সাহেবগুলো আমাকে আর ওর কাকাকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। ঠিক সময় এই ছেলেটি রিভলভারের গুলি চালিয়ে সাহেবটির হাত থেকে মেশিনগানটা ফেলে দেয়। তাই তো আমরা সবাই বেঁচে গেলাম।

কৌশিক ভার্মা প্রশংসার চোখে তাকালেন সন্তুর দিকে। তারপর তার কাঁধ। চাপড়ে দিয়ে বললেন, ব্রেভ বয়! এইটুকু ছেলে রিভলভার চালাতে জানে? টিপও নিশ্চয়ই খুব ভাল।

সন্তু লজ্জা-লজ্জা মুখ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। সে তো এমন কিছু করেনি। আনতাবড়ি একবার রিভলভার চালিয়ে দিয়েছে। সে যে এর আগে কখনও রিভলভার চালায়ইনি সে কথা আর বলল না।

কৌশিক ভার্মা বললেন, হি মাস্ট গেট আ রিওয়ার্ড। আমরা শুধু জারোয়াদেরই ভয় পেয়েছিলাম, সাহেব ডাকাতদের কথা ভাবিইনি। সত্যিই সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হয়ে যেতে পারত। কিন্তু আপনি এখানে কী করে এলেন?

কথা বলতে বলতে ওঁরা ঢুকলেন কুঁড়েঘরের মধ্যে। সেখানে সেই গীতা বইটি আর বহুকালের পুরনো একজোড়া হাতকড়া দেখে কৌশিক ভার্মা আবার চমকে উঠলেন। তিনি বললেন, আমরা জানতাম, সভ্য জগতের সঙ্গে জারোয়াদের কোনও সম্পর্কই নেই, অথচ দেখছি, তাদের রাজা একজন লেখাপড়া-জানা মানুষ!

মাটির ওপরে বসে পড়েছেন। সেখান থেকে তিনি বললেন, এই গুণদা তালুকদার এক সময় ছিলেন একজন নামকরা বিপ্লবী। আন্দামান জেলা থেকে ইনি পালিয়ে যান। সে বহুবহু বছর আগেকার কথা। সকলের ধারণা ইনি মারা গেছেন। স্বাধীনতার ইতিহাসের প্রত্যেক বইতে এর নাম আছে, ছবি আছে। এঁর জন্মদিনে উৎসব হয়।

কৌশিক ভার্মা বললেন, হ্যাঁ, এখন আমারও মনে পড়েছে। এ যে দারুণ ব্যাপার। দিল্লিতে ফিরে গিয়ে এই খবর দিলে তো বিরাট হৈচৈ পড়ে যাবে! কিন্তু আপনি এখানে এলেন কী করে?

বুড়ো রাজা বললেন, এই হাতকড়ি বাঁধা অবস্থাতেই জেল থেকে পালিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমাকে হাঙরে কুমিরে খেয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু খায়নি। ভাসতে-ভাসতে এসে ঠেকেছিলাম এই দ্বীপে।

জারোয়ারা আপনাকে মারেনি?

জারোয়ারা এমনি-এমনি কাউকে মারে না। এরা অত্যন্ত সভ্য। তোমরাই এদের হিংস্র বানিয়েছ।

তারপর থেকে আপনি এখানে থেকে গেলেন?

হ্যাঁ। আমি পরাধীন ভারতবর্ষে থাকব না ঠিক করেছিলাম, তাই এখানে শুনিয়ে স্বাধীন হয়ে থেকেছি। আমি আর বাইরের কোনও খবর রাখিনি।

এই আন্দামানে তো নেতাজী এসেছিলেন, কিছুদিনের জন্য স্বাধীন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, তাও জানেন না।

এই দ্বীপের বাইরের কোনও খবরই আমি রাখি না। ইচ্ছে করেই রাখতে চাইনি। আমি যে এখানে আছি, তা জানতে পারলেই ইংরেজ সরকার আবার আমাকে বন্দী করত। সুভাষবাবু যে কবে নেতাজী হলেন, একটু আগে পর্যন্ত তাও জানতাম না!

কৌশিক ভার্মা বললেন, আশ্চর্য! সত্যি আশ্চর্য! কিন্তু গোটা ভারতবর্ষই তো অনেক দিন স্বাধীন হয়ে গেছে! আপনি সে খবরও পাননি?

কাকাবাবু বললেন, উনি সে-কথাও বিশ্বাস করতে চাইছেন না। শুনুন, এই কৌশিক ভার্মা, ইনি গভর্নমেন্টের একজন বড় অফিসার। এঁকে জিজ্ঞেস করুন, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে সেই সাতচল্লিশ সালে। আপনি জওহরলাল নেহরুর নাম শুনেছিলেন তো?

বুড়ো রাজা বললেন, হ্যাঁ। মতিলাল নেহরুর ছেলে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়েছিল।

সেই জওহরলাল হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। সে-ও তিরিশ বছর আগে।

গান্ধী কোথায়?

গান্ধীজী মারা গেছেন স্বাধীনতার এক বছর পরে। আপনাদের সময়কার প্রায় কেউ-ই বেঁচে নেই। চলুন, আপনি দিল্লি চলুন, সেখানে গিয়ে সব শুনবেন?

বুড়ো রাজা ভুরু তুলে বললেন, কোথায় যাব? দিল্লি? কেন? আমি কোথাও যাব না–

সে কী, আপনি এখনও এখানে থাকতে চান?

নিশ্চয়ই! আমি এখানে জারোয়াদের নিয়ে পরম শান্তিতে আছি।

আপনি স্বাধীন দেশে একবার ঘুরে আসতেও চান না? আপনার অনেক আত্মীয়-স্বজন হয়তো এখনও বেঁচে আছে, তাদেরও দেখতে চান না একবার?

না।

বুড়ো রাজা কিছুতেই তাঁর জারোয়া-রাজ্য ছেড়ে আর যেতে চান না। কোথাও। কাকাবাবু আর কৌশিক ভার্মা অনেক করে বোঝাতে লাগলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনবেন না। শেষে একবার রেগে উঠে বললেন, আপনারা যদি আমাকে জোর করে বন্দী করে নিয়ে যেতে চান, সেটা আলাদা কথা! তবুও সাবধান করে দিচ্ছি, আমাকে জোর করে নিতে গেলে সব জারোয়া একসঙ্গে মিলে বাধা দেবে। তারা প্রাণ দিয়েও আমাকে বাঁচাতে চাইবে।

কৌশিক ভার্মা বললেন, না, না, আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাব কেন? আপনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। আপনি দেশ স্বাধীন করার জন্য এত কষ্ট করেছেন। কিন্তু আমরা ফিরে গিয়ে যখন আপনার কথা বলব, কেউ বিশ্বাস করবে না?

সন্তু হঠাৎ বলে উঠল, ছবি তুলে নিয়ে গেলে সবাই বিশ্বাস করবে।

কাকাবাবু রাগ করে সন্তুর দিকে তাকালেন, সন্তু থতমত খেয়ে গেল। সে বুঝতে পারেনি, সে ভুল কথা বলে ফেলেছে।

সাদা দাড়িওয়ালা প্রীতম সিং এক পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। এবারে তিনি বললেন, কেয়া তাজব কি বাত্! আমি এতদিন জারোয়াদের সঙ্গে কথা বলেছি, কোনওদিন তারা জানতেও দেয়নি যে, তাদের একজন বাংগালী রাজা আছে। সেইজন্যই তারা বেশি ভেতরে ঢুকতে দিত না।

বুড়ো রাজা বললেন, সেটাই ছিল আমার হুকুম।

কাকাবাবু হতাশভাবে বললেন, তাহলে আপনি কিছুতেই যাবেন না?

বুড়ো রাজা বললেন, না।

সন্তু কিছু না বুঝে এগিয়ে গিয়ে বুড়ো রাজার হাত ধরে বলল, আপনি চলুন না। আমাদের সঙ্গে। একবারটি গিয়ে সব দেখে শুনে আবার এখানে ফিরে আসবেন। জানেন, হাওড়া স্টেশনে মাটির তলা দিয়ে রাস্তা হয়েছে, আপনি তো সেসব দেখেননি।

বুড়ো রাজা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। সন্তুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ওরে, তুই আমাকে একথা বললি কেন? তোর মতন আমার একটা ছোট ভাই ছিল, জেলে আসবার আগে তাকে ঠিক এই বয়েসী দেখে এসেছি। তোকে দেখেই তার কথা মনে পড়ছে।

কাকাবাবু বললেন, হয়তো আপনার সেই ভাই এখনও বেঁচে আছেন। আপনি গেলে তাকে দেখতে পাবেন।

বুড়ে রাজা একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর চোখের জল মুছে বললেন, ঠিক আছে, আমি যাব! কিন্তু তার আগে তোমাদের কয়েকটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে?

কাকাবাবু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী প্রতিজ্ঞা করতে হবে বলুন!

বুড়ো রাজা বললেন, তোমাদের কথা দিতে হবে, আমার এই জারোয়াদের কেউ কোনও ক্ষতি করবে না। এই দ্বীপে অন্য কেউ আসতে পারবে না। জারোয়াদের ঐ পবিত্র আগুন তোমরা নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না। ওরা যে-রকমভাবে বাঁচতে চায়, সেইরকমভাবে থাকতে দেবে।

কাকাবাবু তাকালেন কৌশিক ভার্মার দিকে।

কৌশিক ভার্মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কথা দিচ্ছি, এগুলো সব মানা হবে। এগুলোই তো আমাদের নীতি।

বুড়ো রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ঠিক আছে, তা হলে চলো, কিন্তু কয়েকদিন থেকেই আমি আবার ফিরে আসব কিন্তু!

কাকাবাবু বললেন, নিশ্চয়ই। আমি নিজে সব ব্যবস্থা করে দেব।

বাইরে প্রত্যেকটি সাহেবের হাত পিঠের দিকে মুড়ে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। সন্তু যে সাহেবটিকে গুলি করেছিল, সেও মরেনি, দুটো গুলিই লেগেছে তার কাঁধে। হেলিকপটারে কিছু ওষুধপত্র ছিল, তাই দিয়ে তাকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সৈন্যদের পাহারায় সাহেবদের পাঠিয়ে দেওয়া হল সমুদ্রের দিকে। ওখান থেকে লঞ্চে করে নিয়ে যাওয়া হবে ওদের।

বাকিরা সবাই হেলিকপটারে যাবে।

কিন্তু বুড়ো রাজাকে হেলিকপটারে তোলার সময় সে একটা দৃশ্য হল বটে। বুড়ো রাজা জারোয়াদের ভাষায় বুঝিয়ে বললেন ওঁর চলে যাবার কথা। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি জারোয়া মাটিতে মুখ গুঁজে একটা অদ্ভুত করুণ শব্দ করতে লাগল। এই ওদের কান্না। কান্নার সময় ওরা কারুকে মুখ দেখায় না। কয়েকটি জারোয়া মেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বুড়ো রাজাকে। তারা কিছুতেই ওঁকে যেতে দেবে না। তিনি হাত-পা নেড়ে অনেক কষ্টে ওদের বোঝাতে লাগলেন, তাঁর চোখ দিয়েও জল পড়ছে। তিনি মাটিতে মুখ-গোঁজা প্রত্যেকটি জারোয়ার গায়ে হাত দিয়ে বলতে লাগলেন, আমি ফিরে আসব, কদিনের মধ্যেই ফিরে আসব।

কৌশিক ভার্মা কাকাবাবুকে বললেন, মানুষ মানুষকে যে এত ভালবাসতে পারে, আগে কখনও দেখিনি। এদের ভালবাসা কত আন্তরিক?

কাকাবাবু বললেন, হুঁ।

তারপর এক সময় হেলিকপটার আকাশে উড়ল। সমস্ত জারোয়া একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে চিৎকার করতে লাগল, বুড়ো রাজাও হাত নাড়তে লাগলেন তাদের দিকে। একটু বাদেই হেলিকপটার চলে এল সমুদ্রের ওপর।

পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছতে বেশি দেরি লাগল না। দূর থেকেই দেখা যায়। জেলখানাটা। ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত সেলুলার জেলা। পোর্ট ব্লেয়ারে এখনও সেটাই সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। আকাশ থেকে সেদিকে এক দৃষ্টি তাকিয়ে রইলেন্স বুড়ো রাজা। একদিন তিনি এই জেল থেকে পালিয়েছিলেন। আজ সত্যিই সেখানে রাজার মতন ফিরে আসছেন।

পোর্ট ব্লেয়ারে থাকা হল মাত্র একদিন। এর মধ্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হল কলকাতা আর দিল্লিতে। ঠিক হল, কলকাতায় প্রথমে তিনি তিনদিন থাকবেন। তারপর যাবেন দিল্লিতে। সেখানে যে কদিন তাঁর থাকতে ইচ্ছে হয়। তিনি থাকবেন। তারপর যেদিন ফিরে আসতে চাইবেন, সেদিন আবায় কলকাতা হয়ে ফিরবেন।

পরদিন বিশেষ বিমান ওঁদের নিয়ে এল। কলকাতায় দমদম এয়ারপোর্টে কী সাঙ্ঘাতিক ভিড়। হাজার হাজার মানুষ এসেছে জারোয়াদের রাজাকে দেখতে। আরও কত খবরের কাগজের লোক, ফটোগ্রাফার। আলোর বিলিক দিয়ে ফটো উঠছে ঘন ঘন। সন্তুরও ছবি উঠে যাচ্ছে খুব, কারণ বুড়ে রাজা তারই কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কিনা!

মাঝে মাঝেই ধ্বনি উঠছে, গুণদা তালুকদার জিন্দাবাদ!

এয়ারপোর্টে সন্তুর মা-বাবা, দুই দাদা, পাশের বাড়ির রিনি, বাবলু, পিংকুরাও এসেছে, কিন্তু সন্তু তো এক্ষুনি বাড়ি যাবে না। বুড়ো রাজার সঙ্গে এখন তাদেরও যেতে হবে রাজভবনে, সেখানে গভর্নর তাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে মধ্যাহ্নভোজ খাওয়াবেন। লাটসাহেবের বাড়ি খাওয়া তো যে-সে কথা নয়।

লোকেরা এত ফুলের মালা দিচ্ছেন যে, তার ভারেই আরও বুকে পড়ছেন বুড়ো রাজা। এত ভিড়ের মধ্যে তাঁর কষ্ট হবে বলে কৌশিক ভার্মা তাড়াতাড়ি তাঁকে গাড়িতে তুললেন। কাকাবাবু আর সন্তুও সেই গাড়িতে।

গাড়ি এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। আবার কলকাতায় ফিরে সন্তুর খুব আনন্দ হচ্ছে। এবার যে বেঁচে ফিরে আসতে পারবে তাতেই খুব সন্দেহ ছিল।

সন্তু বুড়ে রাজাকে বলল, জানেন তো, এই রাস্তাটার নাম ভি আই পি রোড। আপনাদের সময় তো এটা ছিল না।

বুড়ো রাজা কোনও উত্তর দিলেন না।

কাকাবাবু বললেন, তখন এসব জায়গাতেও জঙ্গল ছিল।

গাড়ি চলতে লাগল, আর সন্তু নানান রকম খবর দিতে লাগল বুড়ো বাজাকে। এটা বিধান রায়ের মূর্তি, ঐ যে ঐখানে শিশু উদ্যান, এই জায়গাটার নাম কাঁকুরগাছি...

বুড়ো রাজা একটাও কথা বলছেন না।

গাড়ি মানিকতলা পেরিয়ে যখন বিবেকানন্দ রোড দিয়ে ছুটছে সেই সময় বুড়ো রাজা হঠাৎ উঃ শব্দ করে দুহাতে মুখ ঢাকলেন।

কৌশিক ভার্মা ও কাকাবাবু দুজনেই ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে বললেন, কী হল? কী হল?

বুড়ো রাজা উত্তর না দিয়ে আঃ আঃ শব্দ করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

কৌশিক ভার্মা বললেন, এ কী! উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, সামনেই আমার এক বন্ধুর ডাক্তারখানা। ঐ যে ল্যাম্পপেস্টের পাশে- ওখানে গাড়ি থামান!

কাকাবাবুর বন্ধু ডাক্তার, সামনেই তিনি বসে আছেন। সবাই মিলে ধরাধরি করে বুড়ো রাজাকে ভেতরের চেম্বারে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল।

ডাক্তারের ওষুধে একটু পরেই জ্ঞান ফিরল। বুড়ো রাজার। ডাক্তারবাবু বললেন, ওঁকে এক্ষুনি কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। হার্টের অবস্থা ভালো নয়।

বুড়ো রাজা বললেন, না, না–

কাকাবাবু ঝুঁকে পড়ে বললেন, আপনার কষ্ট হচ্ছে? হাসপাতালে গেলেই ডাল হয়ে যাবেন। এখন কলকাতায় ভাল ভাল হাসপাতাল আছে।

বুড়ো রাজা বললেন, না, না, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো।

ফিরে যাবেন? হ্যাঁ, যাবেন, কয়েকদিন পরে–

বুড়ে রাজা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, না, এক্ষুনি। তোমাদের এখানে আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না। এখানকার বাতাস এত খারাপ, এখানে এত শব্দ, এত মানুষ, এত বাড়ি- আমার সহ্য হচ্ছে না।রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে দেখলাম মানুষ ভিক্ষে করছে, রোগা রোগা ছেলে, না না, আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো...

কাকাবাবু কিছু বলতে গেলেন, তার আগেই দুবার হেঁচকি তুললেন বুড়ো রাজা। অতি কষ্টে ফিসফিস করে বললেন, আমি পারছি না। এখানে থাকতে পারছি না, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, এত ধুলো এখানকার বাতাসে, এত শব্দ-

বুড়ো রাজা জোর করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই পড়ে গেলেন। সবাই ধরাধরি করে আবার শুইয়ে দিলেন তাকে। বুড়ো রাজার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। খুব আস্তে আস্তে

আপন মনে বলতে লাগলেন, আমি কেন এলাম! কত ভাল জায়গায় ছিলাম। আমি-সেখানে বাতাস কত টাটকা-পাখির ডাক, গাছের পাতার শব্দ, আর ঝর্নার জলের শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই, সেখানে কেউ ভিক্ষে করে না, সেখানে কত শান্তি, সেই তো আমার স্বর্গ! কেন এলাম, আমাকে নিয়ে চলে। এক্ষুনি এক্ষুনি-আমি যাব-আঃ!

হঠাৎ বুড়ো রাজার কথা থেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সকলের মুখগুলোও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, উনি কি–

কাকাবাবু কিছু উত্তর দিলেন না। মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। সন্তু জীবনে এই প্রথম দেখল, কাকাবাবুর চোখে জল।

সেও আর সামলাতে পারল না। শব্দ করে কেঁদে উঠল।